শিরী-ফরহাদ

এম্, নাসির উদ্দিন প্রণীত।

মূল্য পাঁচ সিকা

কলিকাতা
দি মোসলেম প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং
কোম্পানী লিমিটেড হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[স্বত্ব সংরক্ষিত।]

১৯৩৫

বেঙ্গল আর্ট প্রিন্টিং হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত
(বেঙ্গল আর্ট ষ্টুডিও বিল্ডিংসে)
১নং সরকার লেন, কলিকাতা।

"এক লহমা অপেক্ষা কর, বিশাল পারস্য সম্রাজ্যের অধীশ্বর নতজানু হ'য়ে অনুরোধ ক'রছে, এ তসবির আমায় আর এক মুহূর্ত দেখ্‌তে দাও।" (৭ পৃষ্ঠা)

শিরী-ফরহাদ

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পারস্যের সীমারেখা চুম্বন করিয়া সুবিশাল ক্যাস্পিয়ান তখনও অতীতের কীর্ত্তিগাথা বক্ষে লইয়া, শিরোপরি গরিমাদীপ্ত অনবনত 'এলবার্জ' পর্ব্বতমালার বিজয়-কিরীট পরিধান করিয়া, জীমূতমন্দ্রে তরঙ্গায়িত হইতেছিল; তখনও মদগর্ব্বভরা সমৃদ্ধিশালী 'তাব্রিজের' পণ্য-প্রসিদ্ধি পৃথিবীর দূর দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছিল; ফেনিল শুক্তিগর্ভ পারস্যোপসাগর রণতরীপুঞ্জ থরে থরে সাজাইয়া রাখিয়া কর্ম্মবীর সুকৌশলী 'ইলাম সাইরসের' বীরত্বপূর্ণ গৌরব কাহিনীর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল; দুর্ভেদ্য অলঙ্ঘ্য দৃঢ়প্রাচীর তুর্কীস্থানের জয়লিপ্সা উপেক্ষায় উড়াইয়া দিতেছিল; শত্রুর শাণিত কৃপাণ ইস্পাহানের মসনদে অধিষ্ঠিত সোলতানের নামে হস্ত ভ্রষ্ট হইয়া

যাইত। তখনও সৌন্দর্য্যমালিনী উর্ব্বরা পারস্তভূমির খাস্তা, খোবাণী, পেস্তা, আখরোট, আঙ্গুর প্রভৃতির সুরসাল সুস্বাদু বৃক্ষরাজি জগতের ঈর্ষাস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; দেশ মাতৃকায় পুণ্যসেবায় পারস্যের অণু-পরমাণু আত্মাহুতি দিতে ছুটিয়া যাইত। তখনও কানন-কুন্তলা উদধিমেখলা পারস্যরাণী পুষ্পসম্ভারে, অপূর্ণা চঞ্চলা কুমারীবৎ 'দিয়ার-বকর' হ্রদের জ্যোৎস্নাস্নাত সৈকতভূমে কিম্বা 'ইউফ্রেটিস' নদীর নীলাম্বুরাশিতে বিবসনা হইয়া নৃত্য করিত। প্রতি অঙ্গ বিক্ষেপে উদ্দাম রূপজ্যোতিঃ উছলিয়া উঠিত; প্রতি ঊর্ম্মিলহরে তানতরঙ্গময়ী প্রবাহিনী অপ্সরানিন্দিত কণ্ঠে সে অপার্থিব সৌন্দর্য্যের, সে অনুপম রূপচ্ছটার কুলু কুলু শব্দে স্তুতিগান করিত, আর শীকর সম্পৃক্ত সমীরণ, পল্লবে শাখায় মৃদুবীণ বাজাইবার ভার লইত—যথার্থই এ দৃশ্য মনোমদ! চিত্তাকর্ষক—অভিনব! বাস্তব জগতে ইহার তুলনা নাই! পৃথিবীর উপাদান দিয়া যেন ইহা গঠিত নয়! স্বপ্নময়ী কল্পনা লইয়া যেন সেই দুনিয়ার সুনিপুণ চিত্রকর এই মানসী প্রতিমাটীতে রং ফলাইয়াছেন—এই তন্দ্রালসা মূর্ত্তিখানি অঙ্কিত করিয়াছেন!

ইস্পাহান সহর এই পারস্যের রাজধানী। বাণী ও ঋদ্ধির কেন্দ্রভূমি, শিক্ষা ও দীক্ষার লীলা-নিকেতন!

রাজপথের দুই পার্শ্বে শ্বেত প্রস্তর-নির্ম্মিত সমুন্নত হর্ম্ম্যরাজি ভাস্করের চারু নৈপুণ্যে খোদিত হইয়া, একদিকে স্থপতি বিদ্যার প্রশংসাবাদ করিতেছিল, অন্যদিকে গৃহস্বামীদের সুরুচির পরিচয় দিতেছিল। প্রাসাদসংলগ্ন শোভনোদ্যান হইতে নানা জাতীয় সদ্যঃপ্রস্ফুটিত পুষ্পরাশির সুমধুর সৌরভ বায়ুহিল্লোলে ভাসিয়া আসিয়া ক্লান্ত পথবাহীর অবসাদ ব্যথিত মুখখানির ম্লানিমা মুছিয়া লইত; আর অদূরে রাজপ্রাসাদের তোরণদ্বার হইতে বিভাষ, ললিত, মালশ্রী, বসন্ত, পুরবী, সাহানা অতি প্রত্যূষে বাজিয়া উঠিত, মধ্যাহ্নে কাঁপিয়া কাঁপিয়া থামিয়া যাইত, দিবাবসানে বিষাদের সুরে গা ঢালিয়া দিত। সময়ভেদে সারা ইস্পাহান যেন নহবতের সঙ্গে সঙ্গে হাসিত, অশ্রু মুছিত—বিরহের স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিত।

যে ইস্পাহান এক সময় পুনঃ পুনঃ বৈদেশিক আক্রমণে শ্রীহীন হইয়া গিয়াছিল, যে ইস্পাহানের বক্ষঃ হইতে নির্ম্মম আততায়ীগণ একাধিক বার দিগ্বিজয়ের নাম করিয়া মুক্তা, মাণিক্য, ঐশ্বর্য্য-সম্পদ তস্করের ন্যায় অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, যে ইস্পাহানের আধিপত্য লক্ষ্য করিয়া শত সহস্র তরবারী কোষমুক্ত হইয়াছিল, যে তৃষ্ণাতুর ইস্পাহান এক সময় রক্তপ্লাবনে পিপাসা দূর

করিয়াছিল, যে ইস্পাহানের প্রতি প্রস্তর গ্রথিত করিতে এক একটা মহাসমর হইয়া গিয়াছিল, সেই ইস্পাহানের বাদসাহি তক্তে আজ বিপ্লববাদীদিগের ধ্বংশ সাধন করিয়া মহাত্মা আর্ত্তজারিসের * বংশধর খসরুসাহ অধিষ্ঠিত—এই পারস্য তাহার পিতৃপুরুষের অস্থিমজ্জা! সাহজাদা খসরু শক্তিমান, বিচক্ষণ, প্রজাবৎসল।

প্রকৃতির লীলা-নিকেতন ইস্পাহানের নিভৃতকুঞ্জে পারস্যের শিল্প কলাময় রাজপ্রাসাদ! যুগ যুগান্তর ধরিয়া যাহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয় নাই, যে রাজপুরী গঠনে শত সহস্র বর্ষের সঞ্চিত অপরিমেয় ধনভাণ্ডার নিঃশেষিত হইয়াছে, পিতা যাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন প্রপৌত্র সিংহাসনে বসিয়াও তাহার শেষ দেখিয়া যান নাই—সেই পারস্যের রাজগৃহ মাত্র চল্লিশটী শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভে দণ্ডায়মান; প্রত্যেক স্তম্ভ চারিখানি মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত, তদুপরি এক একটী সিংহমূর্ত্তি ছাদ ধারণ করিয়া অবস্থিত। কক্ষগাত্রে মতি, মাণিক্য, জহরত দিয়া কৃত্রিম লতা বিতান, কোথাও মরকতের সুপক্ক দ্রাক্ষাফলে পোকরাজ নির্ম্মিত

* পারস্য রাজবংশীয় আর্ত্তজারিস ২৩০ খৃষ্টাব্দে রাজছত্র ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা প্রায় তিন শত বৎসর যাবত শান্তির সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

দধিয়াল, প্রবালের চঞ্চু দিয়া যেন বৃথাই রেখাঙ্কিত করিতে চেষ্টা পাইতেছে ; কোথাও সূর্য্যকান্ত মণির স্ফটিকাধারে পান্নার লোহিত সিরাজী পান করিতে 'আমু' দরিয়ার কৃষ্ণপ্রস্তরের ভৃঙ্গরাজ ছুটিয়া আসিতেছে ; আর কোথাও শুক্তিগর্ভ হইতে মুক্তার জ্যোতিঃরেখা উঁকি মারিতেছে। ইত্যাদি নানা প্রকার সুদৃশ্য লতা, পুষ্প, হ্রদ প্রাসাদের প্রতি প্রকোষ্ঠে স্থান পাইয়া তাহাকে অমরপুরী করিয়া তুলিয়াছে।

স্বর্গৈশ্বর্য্য যে অলক্ষ্য বিশ্বকর্ম্মা সৃষ্টি করিয়াছেন ; যাঁহার মন্দার কাননে ঋতুরাজ বসন্তের নিত্য উৎসব— অলকানন্দা তটে সদাই তারকা-কুন্তলা হুরীর নৃত্য, তিনি যদি কখনও ভ্রমক্রমে পারস্যের রাজগৃহে পদার্পণ করেন, গর্ব্ব নয়—অহঙ্কার করিতেছি না কিন্তু সাফল্যের স্ফীতবক্ষে বলিতে পারি, তাঁহাকেও বলিতে হইবে বোধ হয় বেহেশ্‌তের অনুকরণে আসমানের ছায়া লইয়া পারস্যের রাজপুরীর সৃষ্টি হইয়াছে।

রজনী গভীরা। নিদ্রার পেলবস্পর্শে মরজগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলেই বিস্মৃতির অঙ্কে ঢলিয়া পড়িয়াছে। শব্দময়ী রাজপুরী নিস্তব্ধ, নিথর, নিস্পন্দ। রংমহলের এক নিভৃত কক্ষে, সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে কিঙ্‌খাপের উপাধানে মস্তকটী রক্ষা

করিয়া, শাহান্‌শাহ্‌ বাদসাহ খসরু এই যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। কি যেন কি ভাবিতে ভাবিতে, কি যেন কি তর্ক করিতে করিতে সবেমাত্র চক্ষু মুদিয়াছেন, এখনও যেন চিন্তার সব রেখাগুলি সুঠাম ললাটদেশ হইতে মুছিয়া যায় নাই। গৃহের মধ্যস্থলে রজতাধারে একটী সুগন্ধি তৈলের দীপ জ্বলিতেছে। কক্ষতলে আস্তৃত গালিচার উপর সেতার, বীণ, এস্‌রাজ ও সারঙ্গ পড়িয়া রহিয়াছে। যেন এইমাত্র একটী সঙ্গীতের উৎসব ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; এখনও তার মূর্চ্ছনা যেন কক্ষটীর দিকে দিকে ঝঙ্কৃত হইতেছে। উন্মুক্ত বাতায়ন পথ দিয়া হেনা, মল্লিকা, চামেলী, গন্ধরাজ ও বস্‌রাই প্রভৃতি কাসগর, তুরান, হিন্দুস্থান, জাপ ও ইরানদেশীয় সুরভি কুসুম নিচয়ের পরিমল বহন করিয়া মলয়ানিল ভাসিয়া আসিতেছে। একটা দুষ্ট পাপিয়া লতাকুঞ্জ হইতে গাহিয়া উঠিল "পিউ, পিউ" আর একটা পাখী সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল "চোখ গেল"। সম্রাট পারভেজ খসরুও চমকিয়া উঠিলেন, তিনি কি যেন এক মোহকর স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, সহসা পক্ষীর শব্দে যেন তিনি পদস্খলিত হইয়া, জেন্নতের সীমা অতিক্রম করিয়া, এই জ্বালাময়ী পৃথ্বীতলে আসিয়া পড়িয়াছেন। নিদ্রার ঘোর তখনও

কাটে নাই; তিনি অর্দ্ধোচ্চারিত, আবেগকম্পিত অস্পষ্ট স্বরে বলিয়া উঠিলেন "এক লহমা অপেক্ষা কর! বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যের অধীশ্বর নতজানু হ'য়ে অনুরোধ করছে, এ মূর্ত্তি আমায় আর এক মূহূর্ত্ত দেখতে দাও! তুমি মুক্ত পুরুষ, তোমারি পবিত্র শোণিত আমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হ'চ্ছে।"

কে যেন ঔদাস্যভরে চলিয়া গেল। ঘুমন্ত সম্রাটের মুখখানিও যেন গম্ভীর হইল, কপালের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিলেন; বলিলেন "আমি দুনিয়ার বাদ্‌শা! তুমি পিতৃপুরুষ! তাই এতক্ষণ তোমার এ ঔদ্ধত্য সহ্য ক'রে এসেছি। দাঁড়াও! আদেশের প্রত্যব্যয় করলে ক্ষমার সীমা অতিক্রম করবে।"

অন্তরীক্ষে কে যেন গর্ব্বভরে ভ্রুকুটি-কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। বাদসাহ এবার কটিদেশে অসি অন্বেষণ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "কাতল কর।"

অমনি একটা অস্ত্রের ঝনৎকারের সহিত উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে একজন হাবসী দাস কুর্নিশ করিতে করিতে সেই গৃহে প্রবেশ করিল, বলিল "জাঁহাপানার হুকুম—বান্দা প্রস্তুত!"

সে স্বরে শাহজাদার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি বড় লজ্জিত হইলেন; কহিলেন "কুদরত খাঁ?"

কুর্নিস করিয়া দাস কহিল "জনাবের আদেশ ?"

"এ মহলের এখনও পাহারা বদলী হয় নাই ?"

"না জাঁহাপানা ! রাত দু'ঘড়ি।"

"যাও এই হীরকের আংটীটা পুরস্কার নাও। আমি নিরাপদ।"

আভূমি সেলাম করিতে করিতে গোলাম অঙ্গুরী লইয়া সেই গৃহ ত্যাগ করিল। বাদশাহ আর নিদ্রা যাইতে পারিলেন না; করতলে গণ্ডস্থল রক্ষা করিয়া কি যেন এক গভীর চিন্তায় নিবিষ্ট হইলেন। স্বপ্নময়ী জড়িমা তাঁহার বিরস অঙ্গে জাগিয়া উঠিল; উন্মনা চিত্তে, অতৃপ্ত আঁখিপটে, সেই মদিরাক্ষীর উছলিত রূপচ্ছবি বিভাসিত হইল; চিন্তাজড়িত মানসক্ষেত্রে এক এক করিয়া কেশ, ললাট, আস্য প্রতিভাত হইয়া সেই নিরুপমা মোহিনী প্রতিমার স্মৃতি রক্ষা করিল—অজ্ঞাতে সম্রাটের চঞ্চল মন এক অনির্ব্বাণ দীপ জ্বালিয়া রাখিল।

কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া শাহজাদা খসরু একটী গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন "বাদসার বাদসা! দয়াময় খোদা! আমি নগণ্য, তৃণাদপি তৃণ—তোমার করুণা ব্যতীত বেহেশ্‌তের সম্পদ লাভ করা আমার ক্ষমতা নয়।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"জনাব! গোলামের গোস্তাকি মাপ্ হয়। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, আপনার পিতা যখন পারস্যের বাদসাহী তক্তে, তখন এ বৃদ্ধ রাজসংসারে প্রবেশ লাভ ক'রেছে। হজরত বেগম—" বৃদ্ধ দুইবার কুর্ণিশ করিয়া ভূমি চুম্বন করিলেন, "—মৃত্যুশয্যায় আপনাকে আমার হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। সাধ্বী সম্রাজ্ঞীর কথা আমি উপেক্ষা ক'ল্লে,এখনি তাঁর সমাধি হ'তে—" বক্তা পুনরায় কুর্ণিশ করিয়া মৃতাত্মার সম্মান রক্ষা করিলেন। "—একটা ধ্বংসকামী অগ্নিময়ী উল্কা ছুটে আস্বে—আমার পাপের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত হ'য়ে যাবে।"

"না শুভানুধ্যায়ী বৃদ্ধ! আমি তোমায় তা বল্‌ছি না; আমার উদ্দেশ্য তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না।"

"জাঁহাপানা! আপনার উদ্দেশ্য বুঝা আমার মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের্ সম্ভব নয়।"

বাদসাহ একটু হাসিলেন; বাঁদীর হাত হইতে আনারের এক পিয়ালা সীরাজী লইয়া কহিলেন "যে মূর্ত্তি আমি স্বপ্নে দেখেছি, তুনিয়ায় সে মূর্ত্তি অসম্ভব!"

"অসম্ভব হ'লেও বান্দা কি শুন্‌তে পারে না?"

"আচ্ছা দাঁড়াও। কোই হ্যায়।"

দ্রুত একজন প্রহরী কুর্ণিশ করিতে করিতে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইল; কহিল "জাহাপানা!"

"যা আমার শয়ন কক্ষে উপাধানের নীচে একটা লেপাফা আছে, জলদী নিয়ে আয়!"

সেনানী যথারীতি সম্মানের সহিত সে গৃহ ত্যাগ করিল; নিমেষ মধ্যে হুকুম তামিল করিল।

বাদসাহের মুখে একটা প্রচ্ছন্ন হাসিরেখা। তিনি স্থির করিয়া রাখিয়াছেন—'বৃদ্ধ বাতুল' 'এ মূর্ত্তির তুলনা নাই' সেইজন্য একটু ঔদাস্যভরে কহিলেন "দেখ যদি কিছু সন্ধান কর্ত্তে পার।" সম্রাটের স্বরে ব্যঙ্গভাব লুক্কায়িত ছিল।

বহুক্ষণ ধরিয়া তস্‌বিরখানা দেখিয়া শুনিয়াও দর্শক কোন অভিমত প্রকাশ করিলেন না। সম্রাট অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন, একটু বিরক্তিভরে কহিলেন "আমি ত আগেই ব'লেছিলাম, সীপার! যদিও তুমি উত্তর মেরু

হ'তে দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ ক'রে এসে থাক,—তা হ'লেও তুমি এ তস্‌বিরের সন্ধান দিতে পার্‌বে না। এ মূর্ত্তি যদি দুনিয়ার হ'ত, তা হ'লে তুমি পারস্যে না হোক, আফগানিস্থান কি পঞ্চনদ, কি স্পেন রাজ্যে এর একটা চিহ্ন পেতে কিন্তু এ যে বেহেশ্‌তের !"

গাম্ভীর্য্যের সহিত মন্ত্রিবর সীপার ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন "শাহানসা ! আমার বিশ্বাসে সন্দেহ কর্‌বেন না—আমি আপনার পিতৃতুল্য বৃদ্ধ উজির !"

সম্রাট একটু লজ্জিত হইলেন, কহিলেন "না উজির সাহেব, তুমি আমার উপকারী, পিতৃবয়স্ক, এই বিশাল সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ, তোমার উপর সন্দেহ ?"

সীপার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "এই আকর্ণ বিস্ফারিত মদিরালস নয়নেন্দিবর, এই আগুলফ্ লম্বিত ভ্রমর কৃষ্ণ অলকদাম, এই পুষ্পধনু লাঞ্ছিত সুঠাম ভ্রূযুগল, এই মনোরম ইন্দুনিভানন—"

বাদসাহ ক্রমেই বিহ্বল হইয়া পড়িতেছিলেন ; বড় করুণস্বরে কহিলেন "না সীপার, যা আরম্ভ করেছ, তার শেষ অংশটা আমায় শুনিয়ে দাও !"

" —আর এই মেহেদি-অঙ্কিত রক্তিম করতল সীপারের চক্ষু অতিক্রম করে নাই। গোলাম জানে কোহস্থানের

অবিবাহিতা রাজকুমারী মালেকা শিরী পারস্যের ভবিষ্যৎ রাজলক্ষ্মী!"

মন্ত্রীবর আত্মগরিমায় একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

বাদসাহ অতীব হর্ষান্বিত হইয়া কহিলেন "ধন্যবাদ উজির সাহেব! খোদা তোমার দর্শন সার্থক করেছেন। যাও, হাজার আস্‌রফি বখ্‌শিস।"

সেলাম করিয়া সীপার কহিলেন "সম্রাটের দান অগ্রাহ্য করিতে ভৃত্যের ক্ষমতা নাই কিন্তু জাঁহাপানার কার্য্যে আত্মনিয়োগ ক'রে অর্থ নিতে সে ঘৃণা বোধ করে।"

সীপার মুখ অবনত করিলেন।

বাদসাহ হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তার পরিচয়তো অনেক দিন পেয়েছি মহৎ! এ আমি খুসীর সহিত দিচ্ছি, আপত্তি তুলো না।"

"সম্রাটের আদেশ শিরোধার্য্য।"

উজির কুর্ণিশ করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিবার সংকল্প করিতেছিলেন, সম্রাট একটু অন্যমনস্কে অঙ্গুরীয় চুম্বন করিতেছিলেন। সীপার দু এক পদ অগ্রসর হইলে বাদসাহ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "উজির সাহেবকে আমি একটু কষ্ট দিচ্ছি। আমার জিজ্ঞাস্য এখনও শেষ হয় নাই।"

সেলাম করিয়া সীপার প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; কহিলেন, "সোব্‌হান আল্লা! দুনিয়ার মালিক আজ আমায় একি কথা বল্‌ছেন?"

"না সীপার আমি তোমায় শুধু উজির বলে মনে করি না—তুমি আমার সুখ দুঃখের সহগামী, হিতৈষী, সৎপরামর্শদাতা ও এই তরলমতি যুবকের একমাত্র অভিভাবক।"

বিনীত ভাবে সীপার উত্তর করিলেন "বান্দা ভাগ্যবান!"

সম্রাট এবার যেন একটু অনুরোধের স্বরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন "উজির সাহেব! সে দিন রজনীতে যখন নিদ্রার কোলে অঙ্গ ঢেলে দিয়েছিলুম, তখন আমার স্বর্গগত পিতামহ পবিত্র শুভ্রবাস পরিধান ক'রে, একটা আলোকমণ্ডলীর মধ্যস্থান হ'তে যে অনুপমা সংসার ললামভূতা রমণীকুল-রত্নকে তিনবার অঙ্গুলী সঙ্কেতে আমায় দেখাইয়েছিলেন এবং এখনও আমি অকৃতদার জেনে পুনঃ পুনঃ তাঁর পাণিগ্রহণ কর্ত্তে আদেশ ক'রে-ছিলেন, তা' কি আমি উপেক্ষা করতে পারি? যে ভাগ্য-বতীকে বিবাহ কর্ত্তে মুক্ত আত্মা উপদেশ দিচ্ছেন, বল বিচক্ষণ! তা' কি লঙ্ঘন করে আমি জাহান্নামে যাবো?

উজির ! বন্ধু ! সীপার ! এর উপায় তোমায় কর্‌তেই হ'বে।”

বাদসাহ অগ্রসর হইয়া সীপারের হাত দুটী ধরিতে যাইতেছিলেন। মন্ত্রী সেলাম করিয়া পিছু হটিয়া আসিলেন ; বলিলেন “পারস্যের মস্‌নদে যে বীর্য্যশালী মহাপুরুষ অধিষ্ঠিত, যার একটী মাত্র অঙ্গুলী সঙ্কেতে শত সহস্র দুর্গদ্বার হ'তে মুহুর্মুহু তূর্য্যধ্বনি হয়, তাঁর ইচ্ছায় কি না হয় জাঁহাপানা ? বৃদ্ধ তার শেষ শোণিত বিন্দু-টুকুও সাহজাদার কার্য্যে অম্লান বদনে ব্যয় কর্ত্তে প্রস্তুত আছে।”

“উপযুক্ত মন্ত্রীর উপযুক্ত কথা ! যাও সীপার, রাজ-ভাণ্ডার হ'তে যত অর্থের প্রয়োজন সঙ্গে নাও। বুশায়ার বন্দর হ'তে আজই রওনা হও। দুনিয়ার এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঢুড়ে এসো। যদি তুমি জয়যুক্ত হ'য়ে আকাঙ্ক্ষিতার সন্ধান নিয়ে আস্‌তে পার, তা' হ'লে তুমি ঐ 'পার্শিপলিসের' নিস্কর অধিকারী ; সম্রাট সিংহাসন হ'তে অবতরণ ক'রে তোমায় তিনবার কুর্ণিশ ক'র্‌বে। আর যদি আমার কাজে তোমার জীবন প্রশান্ত মহাসাগরের অতল বারিগর্ভে কিম্বা সাহারার উত্তপ্ত মরুপ্রান্তরে সমাধিস্থ হয়, তা' হলেও তুমি বড় কম লাভবান হবে না,

তোমারি শিশু পুত্র ইস্পাহানের মসনদে—আর পারস্য সম্রাট দেওয়ানা! কিন্তু সাবধান উজির! নিষ্ফল হ'য়ে ফিরে এলে আমাকে এক অনাবিস্কৃত যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে।

অচঞ্চল হিমাদ্রির ন্যায় সীপার গাম্ভীর্য্যের সহিত উত্তর করিলেন "জনাবের স্বপ্নদৃষ্ট সুন্দরীর সন্ধানে বৃদ্ধকে এত কষ্ট ক'ত্তে হবে না।"

সম্রাট অপলক নেত্রে এই তেজঃপুঞ্জ বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। তিনি যাহার জন্য ব্যাকুল, উন্মত্ত, যাহাকে লাভ করিতে তিনি ব্যয়িত সর্ব্বস্ব হইতেও প্রস্তুত, তাহার সন্ধান যে এত শীঘ্র পাইবেন, তিনি তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারেন নাই। বাদসাহের চক্ষু দুটী জলপূর্ণ হইল, অন্তরে এক কৃতজ্ঞতার নীরব উচ্ছ্বাস জাগিয়া উঠিল, হস্ত দুটী আবেগে ধাবিত হইয়া বৃদ্ধ উজিরকে আলিঙ্গন করিল।

সীপার ভূমি চুম্বন করিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ কহিলেন "দয়াময় খোদা! নগণ্য সীপার আজ তোমার দয়ায় ধন্য হ'ল।" পরে বিনীত ভাবে কহিলেন, "জাঁহাপানা গোলাম এত সৌজন্যের পাত্র নয়।"

"হৃদয়বান বৃদ্ধ! তোমার ব্যবহারে আমি সন্তুষ্ট।

সীপার, কল্যই তুমি কোহস্থান যাত্রা কর।" এই বলিয়া সম্রাট দরবারে যাইবার নিমিত্ত রত্নমণ্ডিত শিবিকায় উঠিতেছিলেন, সীপার অগ্রসর হইয়া কুর্ণিশ করিয়া কহিলেন "গোলামের গোস্তাকী মাপ্ হয়।"

"কেন কি দরকার সীপার ?"

"হুজুরের দু একখানা খবসুরাৎ তস্‌বির।"

"আচ্ছা কালই পাবে।"

"যো হুকুম।"

সেলাম করিয়া মন্ত্রি পদব্রজেই দরবার অভিমুখে চলিয়া গেলেন, সম্রাটের পাল্‌কীও অদৃশ্য হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাজভক্ত উজীর সেদিন এক নগণ্য অপরিচিতের বেশে ইস্পাহানের রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিলেন ; সঙ্গে এক শত আস্‌রফি আর সম্রাটের কয়খানি নয়নরঞ্জন তস্‌বীর। তুরস্কের এক বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হাজার স্বর্ণমুদ্রা লইয়া, তাহার অমানুষিক প্রতিভাবলে বড় চাতুর্য্যের সহিত নির্ভুল করিয়া, এই ছবি কয়খানি অঙ্কিত করিয়াছে। যথায় যাহার সন্নিবেশে চিত্রটীকে মাধুর্য্যময়ী করে, কর্ম্ম-কুশল সুদক্ষ চিত্রকরের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহা অতিক্রম করে নাই। বিস্ফারিত নেত্রযুগল হইতে যেন এক করুণার্থীর সজল অবিকম্পিত দৃষ্টি স্থির হইয়া রহিয়াছে, প্রতি অঙ্গই যেন সংপুষ্ট—সজীব—জাগ্রত! আদর্শের অনুকরণ সত্যতাকে প্রতারিত করিয়াছে! চিত্রকলা ভূয়সী প্রশংসা লইয়াছে। সীপার যাত্রা করিবার সময় সম্রাট একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "উজীর সাহেব! এ তসবীর-গুলি নিয়ে তুমি কার্য্যোদ্ধার ক'র্ত্তে পারবে তো ?"

উত্তরে মন্ত্রিবর একটু উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিলেন "এ ছবি নিয়ে আমি বেহেশ্‌ত থেকে হুরি ভুলিয়ে আনতে পারি, জাঁহাপানা! নিশ্চিন্ত থাকুন। এ কন্দর্পলাঞ্ছিত শ্রীমানপুরুষকে দেখে যে হতভাগিনী ইস্পাহানের শীশমহলে আসতে না চাইবে—সে হয় অন্ধ, না হয় দেওয়ানা।" বৃদ্ধ উজীরের এই কথা শুনিয়া সম্রাট হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। আর অন্য কোন কথার উত্থাপন না করিয়া সীপার সেলাম করিয়া বাদশাহের নিকট বিদায় লইয়াছিলেন।

পথে তাঁহাকে অনেক নির্য্যাতন সহিতে হইয়াছিল। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী হইয়া সামান্য সরাইখানার একটী কদর্য্যকক্ষে অর্দ্ধদগ্ধ পিষ্টক ও এক পাত্র বিস্বাদ-পানীয় পান করিয়া, শত গ্রন্থিযুক্ত একখানি মলিন বিছানার উপর কত সুদীর্ঘ রজনী নির্ণিমেষনেত্রে কাটাইয়া দিতে হইয়াছিল। পোষাকেরও এমন কোন পারিপাট্য ছিল না; সাধারণ লোক মনে করিয়া পান্থশালার অধিকারীও কোন যত্ন লয় নাই। ইহাতে সীপার বড় আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন; তাহার ছদ্মবেশ যে প্রকাশ হইয়া পড়ে নাই এটী তিনি সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। পথে কতকগুলি দর্জ্জির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল,

প্রাচীন লোক মনে করিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "কর্ত্তা! বোধ হয় মক্কা মদীনার দিকে যাবেন?"

সীপার অসম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন "খোদা কি এত ভাগ্য রেখেছেন! আমি কপর্দ্দকশূন্য বৃদ্ধ, ভিক্ষা ক'ত্তে ক'ত্তে কোহস্থানের দিকে যাবার ইচ্ছা আছে।"

একথায় তাহাদের মধ্যে অনেকেই তীব্র বিদ্রূপ করিল। কেহ বলিল "কোহস্থানের বাদশাজাদী বোধ হয় বুড়োকে সাদী কত্তে তলব ক'রেছে?" কেহ বলিল "সুলতানা অনেক দিন ধ'রেই তোমার মত একটা বুড়ো মর্কটের সন্ধান নিচ্চে।" তাহার মধ্যে দুএকজন অপেক্ষাকৃত সুসভ্য ভাষায় বলিয়াছিল "এ মতিচ্ছন্ন কেন তোমার? শেষ ফুৎকারে কাল হয় তো তোমার জীবন নির্ব্বাপিত হবে, কোহস্থানে না পৌঁছিতে পৌঁছিতে হয় তো তোমায় কবর অন্বেষণ ক'ত্তে হবে। তাহা অপেক্ষা যদি তুমি মক্কা বা মদিনার পথে যেতে যেতে প্রাণত্যাগ কর, আত্মার সদগতি হবে—মুক্তি পাবে।"

ইহার উত্তরে বড় নিম্নস্বরে দুএকটী কথা সীপার বলিলেন "আদাব জনাব! বড় সাচ্চা কথা বলেছেন কিন্তু খোদার ইচ্ছা তা নয়, তিনি যে সঙ্কেত ক'রেছেন আমি সেই নিদেশ ল'য়েই ছুটে যাচ্ছি।" সীপার আর

কোন উত্তরের প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া রহিলেন না, গন্তব্য পথাভিমুখে চলিয়া গেলেন। দর্জ্জিরা এই অসম্বন্ধ বৃদ্ধের ভাবভঙ্গী দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের দীর্ঘ আলোচনায় সীপারের পুণ্য চরিত্রেও কলঙ্কের মৃদু রেখা পড়িয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"কি গো মা! চরকা কাট্‌ছ না কি?"

অতি প্রত্যূষে একটা পর্ণকুটীরের আগোড়ের ফাঁক দিয়া একজন আগন্তুক স্নেহপূর্ণ স্বরে দাবায় উপবিষ্টা এক বৃদ্ধাকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা কয়টী জিজ্ঞাসা করিল। প্রাচীনা একবার গ্রীবা উন্নত করিয়া চাহিয়া দেখিল, তারপর পার্শ্বে একটা অর্দ্ধ-সমাপ্ত বাতি জ্বলিতেছিল নিবাইয়া দিল—দ্বারে অতিথি ফিরিয়াও দেখিল না। অপরিচিত একবার নয়, দুইবার নয়, উপর্য্যুপরি অনেক-বার ডাকিল, তথাপি বৃদ্ধার ভ্রুক্ষেপ নাই; একটী কথারও উত্তর নাই। যে আসিয়াছিল সে এবার একটু উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কি গো মা তবিয়েৎ আচ্ছা তো?

"শুন্‌তে পেয়েছি, এখনও কানের মাথা খাই নাই। এত চেল্লাচ্ছ কেন? গোকুর বাড়ী নেই। সে হয়তো এখন কোন দোস্তের আস্তানায় গিয়ে আমোদ প্রমোদ কচ্ছে। তুমি কত রূপেয়া পাও? এলে ভেজ দেবো।"

তারপর পালক পুত্র গফুরের উদ্দেশ্যে বুড়ী কিয়ৎক্ষণ গালিবর্ষণ করিল।

আগন্তুক যদিও এই অসংলগ্ন কথার কোন তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছিল না, তথাপি এইটুকু বুঝিয়াছিল যে গফুর অতিশয় মদ্যপায়ী ও নষ্ট চরিত্র এবং পাওনাদারেরা প্রায়ই তাহার বাড়ীতে যাতায়াত করে, তাহারি মধ্যে একজনকে মনে করিয়া প্রাচীনা এই কথাগুলি বলিয়াছে। আগন্তুক উপায়ান্তর নাই দেখিয়া একটা কৌশল বিস্তার করিল, বলিল "তবে সেলাম মায়ি! আমি সুদূর পারস্য থেকে তোর তাগার সুখ্যাতি শুনে, আধা মাহিনায় এদেশে হেঁটে এসেছি। এখনও আমি গোসল করি নাই। তুই আমায় একটু না দিলি মুখ ধুতে পানি, না দিলি বস্‌তে একটা আসন। আমি দশ আস্‌রফির রেশমীতাগা কিন্‌তুম—খোদা তোর উপর বড় গর্ রাজী!"

এই বলিয়া বক্তা দুই পদ চলিয়া আসিল। বৃদ্ধা কখনও এক সঙ্গে এক আস্‌রফির সুতা কোন খরিদ্দারকে বিক্রয় করে নাই। বিশেষতঃ তাহার সূতা একটু মোটা হয় বলিয়া কেমায়াৎ ওস্তাগারেরা আদৌ পছন্দ করে না। আর আজ একজন নজরবান হুণ্ডিওয়ালা তাহার দ্বার হইতে দশ আস্‌রফি লইয়া ফিরিয়া যাইতেছে! সে

আপনাকে শত ধিক্কার দিয়া কুটীরের বাহিরে আসিল। পথিমধ্যে নতজানু হইয়া বসিয়া আগন্তুকের বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিয়া তাহার সম্মান রক্ষা করিল; বলিল "মেহেরবান্! আমার গরীবখানায় একবার পদার্পণ করুন। আমি বুদ্ধিহীনা স্ত্রীলোক মাত্র, আমার কসুর মাপ্ হয়।

বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়া বুদ্ধিমান অতিথি অতিশয় সংযমের সহিত হাস্য সম্বরণ করিয়াছিল। যেন সেই বর্ষীয়সীর কথা অমান্য করা একান্ত ধর্ম্মবিগর্হিত, তাই অনিচ্ছা সত্বেও রেশমক্রেতা প্রাচীনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছিল। গৃহে আসিয়া বৃদ্ধা অঙ্গনের এক কোণ হইতে বহুদিনের একটা অর্দ্ধভগ্ন কুর্‌ছি বাহির করিল। মনুষ্যের সহবাসে না আসিয়া কেদারাটী এখন নির্ব্বিকারী তাপসের ন্যায় গুরুলঘু অনেককেই আপন বক্ষে স্থান দিয়াছে। তারপর একখানা মলিন রুমাল আনিয়া কুর্‌ছিটী পরিস্কার করিতে করিতে বৃদ্ধা বলিতে লাগিল "বসুন জনাব! আমার এখনই অদৃষ্ট মন্দ হ'য়েছে —না হলে এক সময় আমি চুম্‌কী বসান পেশোয়াজ পরেছি, আমির ওমরাহের কুঠীতে তাঞ্জামে চড়ে দাওয়াৎ রাখ্‌তে গেছি। আমি ইস্তাম্বুলের একজন প্রসিদ্ধ ধন-

বানের অর্দ্ধাঙ্গিনী—আর আজ আমি পথের কাঙালিনী !"

বৃদ্ধা বস্ত্র প্রান্ত দিয়া চক্ষু আবৃত করিল।

আগন্তুক যাহাই মনে করুক কিন্তু একটু সান্ত্বনার স্বরে বলিয়াছিল "সবই খোদার মর্জ্জি ! দুঃখ ক'রে আর কি ক'রবে ?"

"না বাপজান ! আমি দুঃখ করি না। সাহজাদার বিষদৃষ্টিতে পড়ে আমার স্বামী যখন ইস্তাম্বুল হ'তে পালিয়ে এলেন, তখন তাঁরি একমাত্র স্নেহের—এতদিন যে কালসর্পকে দুধ কলা দিয়ে পোষা হ'য়েছিল, পুত্র ব'লে যাকে তিনি বিশ্বাস ক'রেছিলেন, সেই দুষমন—পাঁচ শত মোহরের লোভ সম্বরণ ক'ত্তে না পেরে গোপনে কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করে, তাঁকে সন্ধান দিয়ে এলো। পর্ব্বতের এক সামান্য কুঠীরে স্বামী ঘুমিয়ে পড়েছিল, সারাদিনের পরিশ্রমের পর বাঁদীর চক্ষেও তন্দ্রা এসেছিল। তারপর একটা করুণ আর্ত্তনাদে ঘুম ভেঙ্গে গেল। স্বামীর শেষ স্বর শুনতে পেয়েছিলাম "নসীবন বিবি—ঐ তোমার স্নেহের পালক—পলায়িত অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধের মৃত্যুর সাহায্য ক'ত্তে এসেছে—সবই খোদার ইচ্ছা— !"

শ্রোতা এ দীর্ঘ কাহিনী শুনিতে শুনিতে বড় অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেছিল, তথাপি এরূপ নৃশংসতার পরিচয় পাইয়া একবার চমকিত হইয়া উঠিল।

"—সেই থেকে আমি চরকা কাটি, সূতো বেচে নিজের খানা পানির যোগাড় ক'রি। তবু সেই দুষমণ লেড়কার একটা কড়িও নিয়ে থাকি না। আমায় একদিন সে চারটে মোহর এনে দিতে চেয়েছিল, আমি তাকে পয়জার ছুড়ে মেরেছিলুম; বলেছিলুম "কি কমবখ্‌ত্‌! কবরের মাটী খে'য়েও যদি ম'ত্তে হয়, তবুও তোর মতন শয়তানের পয়সা নিয়ে ইমান্‌খোর হ'তে পারবো না!"

এতক্ষণে প্রাচীনার সুদীর্ঘ কাহিনী সংক্ষেপে শেষ হইল। শ্রোতা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, বলিল "কই মায়ি! তাগা কোথা?"

বৃদ্ধা সসব্যস্তে কক্ষমধ্য হইতে একটী কাপড়ের পুটলী বাহির করিয়া আনিল, আগন্তুককে বড় স্নেহপূর্ণ স্বরে নির্ব্বাচন করিয়া লইতে বলিল। আগন্তুক দশটী আস্‌রফি বৃদ্ধার হস্তে দিয়া বলিল "আমি একবার তোমাদের দেশের খাস দরবারে যাবো। ফিরে যাবার সময় তাগা গুলো সঙ্গে ক'রে নেব।"

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা অতিরিক্ত হাসিতে লাগিল, বলিল "কোথায় যাবেন জনাব? দরবারে? আপনি জানেন না যে কোহস্থানের সুলতান লোকান্তরিত হ'য়েছেন! একথা যে দুনিয়ার সবাই জানে—আঃ কি

আশ্চর্য্য মৃত্যু !" এই বলিয়া বৃদ্ধা বোধ হয় আবার একটা সুদীর্ঘ কাহিনীর অবতারণা করিতেছিল কিন্তু শ্রোতা বাধা দিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "সে কি মায়ি ! তবে এখন কোহস্থানের মস্‌নদ বুঝি শূন্য রয়েছে ?

বৃদ্ধা একটু চটিয়া গেল, বলিল "দুষমনের মুখে ছাই ! ইয়া আল্লা ! কোহস্থানের বাদশাহী তক্তে খোদা যাঁকে বসিয়েছেন তিনি দীর্ঘজীবী হউন !" পরে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিল "আপনি জানেন না যে কুমারী কুল-রাণী শিরি বিবি এখন কোহস্থানের সুলতানা ? তিনিই রাজ্যের বর্ত্তমান অধিশ্বরী। মৃত বাদশাহের কোন পুত্র-সন্তান ছিল না।"

"তা মায়ি বলি তিনি দরবারে বসেন তো ?"

প্রাচীনা এবার ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারে নাই; বড় কর্কশ স্বরে বলিতে লাগিল "তুমি কেমন ধারা বেতমিজ ? কথা একবার বল্লে বুঝতে পার না ? তাঁর সম্ভ্রম আছে, তিনি সুলতান পুত্রী, অপরিচিত বিদেশী হ'য়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা করা পাগলের প্রলাপমাত্র ! তিনি শুধু রঙ্গমহল হ'তে সপ্তাহে একবার জুমলী বাগিচায় হাওয়া খেতে যান।"

আগন্তুক আপনার কৌতুহল দমন করিয়া বড়

স্বাভাবিক স্বরে কহিল "মায়ি, গোসা করিস্ না, আমি এই এদেশে পহেলা আস্ছি। আচ্ছা মায়ি রাজনন্দিনী কখন হাওয়া খেতে যান? সঙ্গে খুব সঙ্গিন পাহারা থাকে তো?"

বৃদ্ধা এবার সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুকের দিকে চাহিয়া রহিল। জিজ্ঞাসক অতি চাতুর্য্যের সহিত মুখখানির উপর সরলতাটুকু বিছাইয়া রাখিয়াছিল। বুড়ী এ কৃত্রিমতা ধরিতে পারে নাই; হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাপজান্! হাঁ দেখবার চিজ! আজ আমার কুটীরে খানা পানী কর। সাঁজের থোড়া-ঘড়ি আগাড়ি বাদশাহের লেড়কী পশ্চিম দিকের ঐ বড় রাস্তাটা ধরে জুম্লী বাগিচায় হাওয়া খেতে যাবেন।" বৃদ্ধা অঙ্গুলি সঙ্কেতে আগন্তুককে জুম্লী বাগিচার রাস্তাটা দেখাইয়া দিল। আগন্তুক অতিশয় আনন্দের সহিত বৃদ্ধার কথাগুলি শুনিতেছিল। আত্মপ্রসাদে তাহার হৃদয়খানা নৃত্য করিতে লাগিল। এত সহজে এত শীঘ্র অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে বলিয়া, তিনি একবার মাত্র ধারণাও করেন নাই। এই বুদ্ধি না থাকিলে কি তিনি পারস্যের রাজস্থ সচিব হইতে পারেন!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

একটা সঙ্কীর্ণ উপত্যকাভূমির সানুদেশে বড় যত্ন-রচিত একটা রম্য উপবন। দক্ষিণে সুদৃশ্য পর্ব্বতমালা, পশ্চিমে পাদদেশে একটা দীর্ঘ কুমুদ-কহ্লার পরিপূর্ণ পার্ব্বত্য-তড়াগ। গিরিনিস্যন্দিনী প্রবলা হাস্না প্রপাতের প্রচণ্ড বারিপাতেই এই তড়াগটার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে স্থানটী বড় রমণীয়! উদ্যানে নানাবিধ পুষ্প-পল্লবের সুরভি সুদর্শন বৃক্ষনিচয়। ফলভরে অবনত মনাক্কা-তরুকে আশ্রয় করিয়া, সবুজ পীত প্রভৃতি নানাপ্রকার কিশোরীলতা তাহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছে; বিধুরা কোকিলা বেদানার ঝোঁপে বসিয়া বসিয়া প্রণয়ীকে ডাকিয়া ডাকিয়া ক্লান্ত হইয়া গিয়াছে; কৃত্রিম উৎসের গোলাববসিত সুস্নিগ্ধ সলিলে ময়ূর ময়ূরী হাসিয়া হাসিয়া পরস্পরের গায় লুটিয়া পড়িতেছে, আঙুরের সুশীতল কুঞ্জে পক্ষীকুলরাণী চাতকিনী দ্বিপ্রহরে থাকিয়া থাকিয়া অনন্ত আকাশের পানে আকুল পিপাসায় চাহিয়া চাহিয়া বড় করুণস্বরে ডাকিতেছে "ফটিক জল", বাগানের

স্থানে স্থানে মর্ম্মর প্রস্তরের সুবিস্তৃত আরামমঞ্চ। তাহার উপর সাঁচ্চার চুমকী বসান মখ্‌মল্ বড়পুরু করিয়া পাতা। মধ্যস্থলে সাহাজাদী সুলতানার মসনদ। এই খানেই সহচরী পরিবেষ্টিতা কোহস্থানের রাজকুমারী প্রতিদিন উদ্যান ভ্রমণে আসিয়া দুই দণ্ড বিশ্রাম করেন।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। নিদাঘতপ্ত ধরিত্রী জননী এইমাত্র ঘামের রেখা একটু একটু করিয়া মুছিয়া ফেলিতে-ছেন। তপনের উগ্রতর তাপ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতেছে। ক্লান্ত জগতের বক্ষে ছির ছির করিয়া একটা মন্দ বাতাস বহিয়া যাইতেছে। সহসা দূরে অশ্বপদধ্বনি শ্রুত হইল। নীরব উদ্যানের মধ্যেও যেন একটা সাড়া পড়িয়া গেল। দ্বারপাল একটা হাতীয়ার লইয়া ফটকের দিকে ছুটিয়া আসিল কিন্তু তাড়াতাড়িতে কুর্ত্তাটা উল্টা করিয়া পরায় কোনমতেই বোতাম আঁটিতে পারিতেছিল না। উদ্যান-রক্ষক আঙ্গুরের গাছে জল দিতে গিয়া, সোনার পিঞ্জরে আবদ্ধ একটী ময়নার মাথায় ঢালিয়া দিল, বাচাল পাখীটা কিছুক্ষণ পক্ষ ঝাড়িয়া সুবেদারী মেজাজে বলিয়া উঠিল "কম্‌বখৎ"। প্রহরিণী বেণী এলাইয়া, তাম্বুলের রাগে ওষ্ঠদুটী লাল করিয়া মঞ্চের নিম্নে সুসজ্জিত রহিল। মুক্তার ঝালর বিশিষ্ট তাঞ্জামে চড়িয়া, শত অশ্বারোহী

বীরাঙ্গনা সঙ্গে লইয়া সুলতানা শিরী উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। প্রহরীরা কুর্নীশ করিয়া সরিয়া গেল।

সাহজাদী শিরী মস্‌নদে আসিয়া উপবেশন করিলেন। পরিচারিকা পা হইতে জরির জুতাটী খুলিয়া লইল। বাঁদী পাখীর পালকের একটী ব্যজনী লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। সখীরা আদর করিয়া পান্নার বালার পাশে একটা বনলতা বাঁধিয়া দিল, মতির হারের সাথে একছড়া বনফুলের মালা স্নেহভরে ঝুলাইয়া দিল, কেশের আগায় দুচারটা গোলাব কুরুবক মতিয়া বাঁধিয়া দিল, কেহ কেহ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। কেহ হাসিয়া বলিল "সাহজাদী এ মহামূল্য পেশোয়াজ ফেলে দিয়ে, ফুলের সাজে সজ্জিত হ'লে রমণীর প্রাণটুকুও কেড়ে নিতে পারেন।"

এর উত্তরে সাহজাদী তাহাকে মৃদু হাসিয়া তর্জ্জনী প্রহারে শাসন করিয়াছিলেন।

হাস্য পরিহাসে প্রায় অর্দ্ধদণ্ড অতিবাহিত হইল। সুলতানা এবার আসন ত্যাগ করিলেন; পারিপার্শ্বিকাগণও তাহার অনুগমন করিল। কেহ কেহ অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইতে দেখাইতে চলিতেছিল, কেহ কেহ পশ্চাতে সঙ্গিনীর কণ্ঠবেষ্টন করিয়া যাইতে যাইতে মৃদু মৃদু গান

গান ধরিয়াছিল। কেহ পার্শ্বে আতরদানী হইতে পুনঃ পুনঃ পুষ্পসার নিক্ষেপ করিয়া, সাহাজাদীর অবেণী সংবদ্ধ কেশপাশ ভিজাইয়া দিতেছিল। আর কেহ কার্পেটের পথিপার্শ্বে দুএকটী মতিয়া বেলা অতি সন্তর্পণে রহস্য করিয়া বিছাইয়া রাখিল। সুলতানার কুসুমকোমল পদনিপীড়নে ফুলগুলি নিষ্পেষিত হইতেছিল; সঙ্গে সঙ্গে মালেকা শিরীও পায়ে কুশাঙ্কুর বিদ্ধের ন্যায় চমকিয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি মুক্ত প্রকৃতির তরুলতায় সংবদ্ধ, কেবল চরণদ্বয় অগ্রবর্ত্তিনীর অনুসরণ করিয়া চলিতেছিল মাত্র। সহসা তিনি নিষ্পন্দের ন্যায় দাঁড়াইয়া পড়িলেন, এবং অঙ্গুলি সঙ্কেতে একজন ইরানী ক্রীতদাসীকে বৃক্ষশাখা-সংবদ্ধ একটা কি নামাইয়া আনিতে বলিলেন। প্রধানা সহচরী দেলেরা একটু স্নেহপূর্ণ তিরস্কারের স্বরে বলিল "ওখানে নিশ্চয় সাহজাদী সুলতানা এমন একটা আস্‌নাই চিজ্‌ দেখ্‌তে পেয়েছেন, তার মূল্য কোহস্থানের রাজভাণ্ডার দিলেও নয়।"

"হাঁ দেলেরা তোর অনুমানকে সেলাম করি।" এতক্ষণে ঝাউগাছের নিম্নশাখা হইতে দাসী একখণ্ড কাগজ তুলিয়া আনিয়া সাহজাদীর হস্তে দিয়াছিল। এক এক করিয়া সেই ক্ষুদ্র পত্র খণ্ড প্রায় সকলের হাতে ফিরিল।

রূপসী রাণী শিরী মাটীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া এই কথাই ভাবিতেছিলেন।—

"সশস্ত্র প্রহরী যে উদ্যানে সর্ব্বদা পাহারা দিতেছে, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতি অদৃশ্য চরেরও যে উদ্যানে প্রবেশের সাধ্য নাই, কোহস্থানের সাহজাদী সুলতানার সেই খাস্ বাগিচায় এমন সময় পুরুষের প্রতিকৃতি কে আনিল? যেই আনয়ন করুক কিন্তু তস্‌বির অনুপম! দেখিলে দর্শন তৃষ্ণা বাড়িয়া যায়।" সুলতানা আলেখ্যখানা অনেকবার দেখিলেন, অনেক ভাব তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল কিন্তু কিছু প্রকাশ করিলেন না। একটা অব্যক্ত দীর্ঘশ্বাস কেবল তাঁহার পুরুষের প্রতি দৃঢ় বীতরাগ শিথিল করিয়া দিবার উপক্রম করিল।

সঙ্গিনীরা কেহ কেহ বিদ্রূপ করিতে লাগিল, কেহ কেহ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, কেহ খোদ পাহারাওয়ালা আমির বক্সের শির লইতে উপদেশ দিল। কেহ এই অনৈসর্গিক কাণ্ডে একটু ভীত হইয়া পড়িল। সাহজাদী কাহারও কথার উত্তর দিলেন না, কোন কথার মীমাংসা হইল না। একবার তাঁহার মনে হইয়াছিল দেলেরাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু লজ্জায় মুখটী আরক্তিম হইয়া উঠিল; চিন্তা-শীলা আরও দুই পদ অগ্রসর হইলেন। সম্মুখেই একটা

আঙ্গুরের লতাকুঞ্জ। সুলতানা পরিশ্রান্ত হইয়া তাহার মধ্যে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু এখনও যার মীমাংসা হয় নাই, যে কথা ভাবিতে ভাবিতে এই কয়টা পদ তিনি চলিয়া আসিয়াছেন, যে ছবি প্রথম দর্শনেই হৃদয় চমৎকৃত হইয়াছে, এখানেও কে যেন একটা সুপক্ক আঙুরের কেয়ারীর মধ্যে সেইরূপ একখানি ছবি আট্‌কাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। আঙুরের পীত আভা প্রতিকৃতির ললাটে বক্ষে পড়িয়া তাহাকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিতেছিল। সাহজাদী এবার স্বহস্তে তস্‌বিরখানি তুলিয়া লইলেন; অনেকক্ষণ ধরিয়া গভীর চিন্তার সহিত তস্‌বিরটী দেখিতে লাগিলেন, ভাবিলেন "আজ তোমার একি পরীক্ষা খোদা! এ তস্‌বির কোন ভাগ্যবানের?"

সহচরীরা পরস্পরের গা টেপা টেপী করিয়া হাসিতেছিল, কেবল দু একজন মৃদু স্বরে বলিয়াছিল "নসীব বহিন, নসীব! কি হবে, কে রক্ষা ক'র্‌বে? বাদশাজাদীকে জীনে পেয়েছে।"

অগ্নি প্রজ্জ্বলিত গৃহমধ্যে যেমন কেহ অবস্থান করিতে পারে না, সেইরূপ সেই লতাকুঞ্জে সাহজাদী শিরী এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিতে পারিলেন্‌ না। আনন্দ উৎসব ভঙ্গ হইল। সকলেরি প্রসন্ন বদন ম্লান হইয়া গেল।

ভূমির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, অতি ধীরে ধীরে সুলতানা আর একটু অগ্রসর হইলেন। সাহজাদীর ঈদৃশ পরিবর্ত্তনের কারণ সহসা কেহ আবিষ্কার করিতে পারিল না। এত পথ তিনি কখন হাঁটিয়া আসেন না—এ দীর্ঘ ভ্রমণ তাঁহার জীবনে ঘটে নাই। কি আশা-মরিচীকার কুহকী প্রলোভনে আজ তিনি ছুটিয়াছেন কেহ তাহা বুঝিতে পারে নাই, কেবল একজন জানিয়াছিল—সে দেলেরা—বুদ্ধিমতী। উত্তরের রাস্তাটায় আর অগ্রসর না হইয়া তিনি এবার পশ্চিমের তীরভূমি দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বেলা আর বেশী নাই। সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ। কেহ আপত্তি তুলিতে সাহস করিল না। চক্রাকার তড়াগটীর সচ্ছসলিলবক্ষে দিনকর অবগাহন করিতেছেন। তরঙ্গে তরঙ্গে লোহিতরাগ উথলিয়া উঠিতেছে। সে লালের বারিসমুদ্রে কুমুদলাল, পদ্মিনী লাল, আকাশ লাল, মীন লাল, বৃক্ষ লাল, পক্ষী লাল, আর ভ্রমণ-পরায়ণা সহচরী-পরিবৃতা সুলতানা তিনিও লাল হইয়া গিয়াছেন; সাহজাদীর বিষাদের মুখেও একটা ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেলেরা মুখে রুমাল দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেমন সুলতানা! এ মূর্ত্তির কাছে কোন মূর্ত্তি লাগে? এমন ক'রে কেউ

আপনার রূপে জগতকে না'ইয়ে দিতে পারে ?" জানি না এ কথার কিছু তাঁহার কর্ণে গিয়াছিল কি না। কারণ এতক্ষণ কেতকীবনে একটী প্রস্ফুটিত কেয়াফুলের দিকে তিনি নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়াছিলেন। দেলেরা যাহা দেখিল তাহা দেখিয়া মোহিত হইল। একে একে সকলে দেখিয়া প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। এক-খানি পূর্ব্বানুরূপ তস্‌বির যেন কোন রসজ্ঞ প্রকৃতিবিৎ সময় বুঝিয়া কেয়াফুলের কাঁটায় ঝুলাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। কুঞ্চিত কেশ লোহিত কৃষ্ণের সংমিশ্রণে এক অভিনব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে, নীলাভ চক্ষু দুটীতে লোহিত সাগরের কৃষ্ণ তারকা ভাসাইয়া রাখিয়াছে, গুপ্ত হাসি যেন লোহিত গণ্ড বিদীর্ণ করিয়া উছলিয়া উঠিতেছে। বেগুনে রঙ্গের মখমলের চাপকান্ লালকে পরাস্ত করিয়া গাঢ় মসী হইয়া গিয়াছে, আর মস্তকে রক্ত শিরস্ত্রাণ হীরা মুক্তার পাশে মখ্‌মলের জমীতে সূর্য্যকিরণ হইতে লোহিত পান্না বসাইয়া লইয়াছে।—এ ছবি যে দেখিবে সে মরিবে! যে দেখিয়াছে সে মরিয়াছে! সুলতানা শিরী উপর্য্যুপরি কয়বার এই তস্‌বিরই দেখিয়া-ছেন কিন্তু এমন করিয়া মুগ্ধ হন্ নাই। আজ তাঁহার গর্ব্ব চূর্ণ হইয়াছে। গর্ব্বস্ফীতা রাজনন্দিনী পুরুষের

রূপমোহে আজ সর্ব্বস্ব হারাইতে বসিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞান নাই, বিবেক নাই, পদমর্য্যাদা নাই, সব ভুলিয়া গিয়াছেন। আত্মসম্ভ্রম বিস্মৃতা হইয়া বিহ্বলা রাজকুমারী সে মনোরম ছবিটী তুলিয়া আনিতে ছুটিয়া যাইতেছিলেন। দেলেরা বাধা দিয়া বলিল "এখনও বাঁদী মরে নাই।"

সুলতানা লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন। দেলেরা তস্‌বীর লইয়া সাহজাদীর হস্তে দিল। রূপসী শিরী প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ ছবিখানি সাদরে বক্ষে ধারণ করিলেন। সকলেই চমকিয়া উঠিল। দেলেরা একটু উত্তেজিত হইয়া কহিল "এ আচরণ মন্দ নয়! এক অজ্ঞাতকুলশীল যুবকের ঘৃণিত তস্‌বীর বক্ষে ধারণ করা কোহস্থানের মস্‌নদে অধিষ্ঠাতা সুলতানারি সাজে, আমরা বাঁদী নগণ্যা—তথাপি এ জঘন্য অভিনয়ের ব্যাভিচার দৃশ্য এ পবিত্র বংশের কোন পর্দ্দানসীন মহিলা স্বচক্ষে দেখ্‌বার কল্পনাও করে নাই। এস সখী আমরা এস্থান ত্যাগ করি। ধর্ম্মের বিরুদ্ধে আকাঙ্ক্ষা উঠেছে, জানের ভয়ে ন্যায়কে লুকিয়ে রাখ্‌বো না।"

এই বলিয়া দেলেরা ঘৃণার সহিত সে স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। সাহজাদীর শিরায় শিরায় আগুন ছুটিয়া গেল। তিনি বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিলেন "এত

অধঃপতনের নিম্নস্তরে এখনও মুসলমান রমণী নামে নাই, স্বামী ভিন্ন অন্য কোন পুরুষকে কোহস্থানের রাজকুমারী পবিত্র বক্ষে স্থান দেয় নাই! এমূর্ত্তি জীবিত হ'ক, কল্পনা হ'ক, মিথ্যা হ'ক, এই মূর্ত্তিই আমার ধ্যানের, পূজার, ইহকালের পরকালের!"

সকলেই ফিরিল। দেলেরা মার্জ্জনা লইয়া সাহজাদীর মস্তকটী আপন বক্ষে টানিয়া লইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তখনও তমিস্রা রজনী আসে নাই; অন্ধকারের গাঢ় তিমিরে পৃথিবী সম্পূর্ণ ঘনীভূত হয় নাই। তখনও দূর কানন হইতে প্রত্যাগত দুই একটা সঙ্গীহারা পাখীর উচ্চ রব শুনা যাইতেছিল। পল্লীবধুরা এইতো সবে গৃহে গৃহে সান্ধ্যদীপের আয়োজন করিতেছে; সবে মাত্র সুমধুর আজানধ্বনী পল্লীপাথার মুখরিত করিতেছে। সবেমাত্র আকাশ প্রাঙ্গণে দুই একটী করিয়া তারকা দেখা দিয়াছে। এখনও ক্রীড়াশীল বালক অঙ্গনে নাচিতেছে—খেলিতেছে,—মায়ের কোলে ফিরিয়া যায় নাই। এখনও কুটীরের পার্শ্ব দিয়া গোধন লইয়া রাখাল ফিরিয়া আসে নাই। কেবল দূরে দুই একজন কৃষক ক্ষেত্রের কাজ সারিয়া সারাদিনের পরিশ্রমের পর স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতে গান ধরিয়াছে :—

"মন মাঝি তোর বৈঠা নিয়ে যেতে পাল্লাম কই !"

গানের শেষার্দ্ধচরণ সেই সরল কৃষকের মুখ হইতে নিস্তৃত হইয়া, সমস্ত পল্লীটাকে যেন মুখরিত করিয়া তুলিতেছে।

দিবস ও সন্ধ্যার এই মধুর সংযোগ স্থলে, আলো ও আঁধারের এই সলজ্জ মিলন বাসরে, বিচালীর এক পর্ণ-কুটীরের উঠানে খট্টার উপর অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় এক গৌর-বর্ণ বৃদ্ধ। তিনি করতলে মস্তকটী রক্ষা করিয়া কি ভাবিতেছেন, আর এক একবার প্রতীক্ষার উদাস চোক দুটী দ্বারপ্রান্তে গিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। তিনি যেন কাহারও আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার হৃদয় উৎকণ্ঠায় অধির হইয়া উঠিল, জুতা জোড়াটা পায়ে দিয়া গৃহের বাহিরে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া যতদূর দৃষ্টি যায় দেখিয়া আসিলেন। অনেকেই সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল কিন্তু যার অন্বেষণে আসিয়াছে সে কই ?

অনেকক্ষণ ঘুড়িয়া ফিরিয়া বৃদ্ধ পুনঃরায় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৈলাভাবে নির্ব্বানোম্মুখ বর্ত্তিকাটী প্রদীপের গর্ভদেশ পর্য্যন্ত উদরসাৎ করিতে সংকল্প করিয়াছিল, বৃদ্ধ দ্রুত আসিয়া তাহাতে তৈল সেক করিলেন। তাহার পর দাবার উপর একটা ছিন্ন চাটাই বিছাইয়া অনেক কথার আন্দোলন করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ইহার পর আরও দুই দণ্ড কাটিয়া গিয়াছে, বৃদ্ধের ঘুম ভাঙ্গে নাই। শিরদেশে দাঁড়াইয়া এক রমণী তাহাকে

কয়েকবার ডাকিল কিন্তু সাড়া পাইল না। অতএব রমণী বাধ্য হইয়া একটা প্রস্তরের উপর আর একটা গুরুভার প্রস্তর খণ্ড সজোরে নিক্ষেপ করিল, সে শব্দে ভীত সন্ত্রস্ত নৈশ পথিকের ন্যায় বৃদ্ধ চমকিয়া উঠিলেন। রমণী এবার মৃদু হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল "জনাব কি ঘুমাচ্ছেন ?" চক্ষু রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে বৃদ্ধ বলিল "না মায়ি ! একটু আলস্য এসেছিল। এত দেরী হলো যে ?"

"প্রাণ নিয়ে যে ফিরে এসেছি এই বহুত আচ্ছা" এ কথায় বৃদ্ধ বসিয়াছিলেন দাড়াইয়া পড়িলেন, মস্তক ঘুরিতে লাগিল, সব আশা ভরসা যেন নিবিয়া গেল, চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, সাশ্চর্য্যের ন্যায় আবেগে বলিয়া উঠিলেন "তবে কি তুই নিস্ফল হয়ে ফিরে এলি বুড়ী মায়ি ? পারস্যের বৃদ্ধ মন্ত্রী—" বৃদ্ধের জীবনের রহস্য প্রকাশ হইয়া যায় বুঝি ! তাই বড় সংযমের সহিত শেষ অর্দ্ধ চাপিয়া গেলেন। সাঁপার এই কথা কয়টী বড় দুঃখে বলিয়াছিলেন কিন্তু রমণী ইহা শুনিয়া হাসিয়া হাসিয়া লুটিয়া পড়িল। হৃদয়হীনা তাগাওয়ালী পরদুঃখে কি শুধু হাসিতে শিখিয়াছে ! একটু সহানুভূতি দেখাইতে জানে না ? যাহা হউক এই দীর্ঘ হাসির অবসানের পর বৃদ্ধা অপেক্ষাকৃত সংযত স্বরে কহিল "তুমি কি আমায় তেমন

কমবখ্‌ত মনে কর মেহেরবান? গিয়াসের কন্যা কখনও কাজের ভার নিয়ে নিস্ফল হ'য়ে ফিরে আসে নাই।"

হর্ষে বৃদ্ধের হৃদয় নাচিয়া উঠিল; চোখে আনন্দকণা ফুটিয়া উঠিল। স্বরে আনন্দ কম্পন অনুভূত হইল, বলিলেন "হাজার হাজার তস্‌লিম মায়ি! তোর কাছে আমি কৃতজ্ঞ, আমাদের বাদসা কৃতজ্ঞ, সমস্ত পারস্য কৃতজ্ঞ! এই নে মতির মালা পুরস্কার। আর তোর কাছে কিছু লুকিয়ে রাখব না, তুই আমাদের বড় উপকার করেছিস। আমি—এই নগণ্য বৃদ্ধ পারস্যের প্রধান উজীর।" এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিল; নত-জানু হইয়া কহিল "হুজরত! আমার কসুর মাফ হয়।"

"না বুড়ী তোর উপর আমি ভারী সন্তুষ্ট। কেমন সুলতানা শিরী তস্‌বির দেখে মোহিত হয়েছেন?"

"শুধু মোহিত হয়েছেন? সেই তস্‌বিরকেই তিনি খসম বলে বক্ষে স্থান দিয়েছেন। ইহাও বলেছেন এ মূর্ত্তি ভিন্ন তিনি অন্য কাহার সহিত পরিণয়ে আবদ্ধ হবেন না।"

"বা! সাবাস্‌ মায়ি! তুই যে কাম করেছিস্‌ তার তুলনা নাই। দুষমন্‌ যেখানে প্রবেশ করতে পারে না সেখান থেকেও একজন সাহজাদীর মন চুরী করে তুই

নিরাপদে ফিরে এলি! আচ্ছা মাঝি, প্রহরীরা তোকে কিছু বল্লে না?"

"তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না বাপ্‌জান! আমি বৃদ্ধা, আমার মনে যে এমন একটা কারসাজি লুকিয়ে থাক্‌তে পারে সশস্ত্র বীরপুরুষেরা তা ধর্ত্তে পারে নাই। খোদার নাম করে সাহ্‌জাদীর কাছে কিছু খানাপানি মাঙতে যাচ্ছি বলে তাদের কাছে হুকুমনামা নিয়েছিলাম। সে ভিড়ে আর কে ধরে? তুমি যেমন যেমন বলে দিয়েছিলে ঠিক সেই ভাবেই ছবিগুলি লট্‌কে দিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে ব'সে রইলাম। সুলতানা বাগানে বেড়াতে বেড়াতে এক এক করে সবগুলিই দেখ্‌লেন কিন্তু ঝোপের মধ্যে সেই কেয়াগাছের ছবিটা দেখে একেবারে পাগল হ'য়ে গেলেন।"

"বলিস্‌ কি তবে আর ভাব্‌বার কিছু নাই?"

"কিছু না, ফাঁদে পাখী ঠিক পড়েছে।" বৃদ্ধ বড় আনন্দিত হইলেন। রমণীকে শত ধন্যবাদ দিলেন। ইহার উপর আরও দু একটা অনাবশ্যকীয় কথার স্রোত ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

তারকাময়ী নিশীথিনী অন্তর্হিতা হইয়াছে। গগনের কোলে দিবসের আলোক রেখা দেখা দিয়াছে। দুই একটা নিশাচর বাদুর ও পেচক তরুকোটরে আশ্রয় লইয়াছে। তন্দ্রাময়ী সুষুপ্তা পৃথিবী জাগিয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ অবসরের পর জগতের কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। প্রতিদিনের ন্যায় আজও প্রভাত হইয়াছে। হয়ত কাহারও কালরাত্রির প্রভাত হইল, এ প্রভাত তাহার নিকট সুপ্রভাত। বন্দির রাত্রি প্রভাতে প্রাণদণ্ড হইবে—বিনিদ্র রজনী ধরিয়া সে প্রভাতের মুখ দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করে নাই, এ কুপ্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার জীবন সন্ধ্যা হইয়া যাইবে। দূরাগত প্রবাসী পতি দীর্ঘ দিবসের পর আজ কয়দিন গৃহে আসিয়াছেন। রাত্রি প্রভাতেই প্রণয়ী কর্ম্মস্থানে চলিয়া যাইবেন, তাই বড় কাতরে বিধুরা কুল-কামিনী বলিতেছে—

"আজি নিশা হ'য়োনা প্রভাত"

কাহারও ক্ষতি বৃদ্ধিতে, কাহারও অভাব স্বাচ্ছন্দে স্বভাবের কিছু আসে যায়না। কাহারও করুণ প্রার্থনায় সৃষ্ট জগতের নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। তোমার সুখ দুঃখ সুবিধা অসুবিধা উপেক্ষা করিয়া চিরদিনের ন্যায় আজও প্রভাত আসিয়া দেখা দিল। হাসিতে হাসিতে দিকে দিকে স্বর্ণ-আভা ফুটিয়া উঠিল!

রাজধানী কোহস্থান নগরের অনেক আমির ওমরাহের গৃহে তখনও শেষ যামের নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল। প্রমোদ-নিশার অবসান হইয়া গিয়াছে, রজত পর্য্যঙ্কে গৃহস্বামী ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, তখনও শয্যা ত্যাগ করেন নাই। রাজপুরীতে প্রভাতের নহবত বাজিয়া গিয়াছে। প্রাসাদদ্বারে স্বতন্ত্র প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছে। অন্তঃপুর-চারিকা বাঁদী, প্রহরিণী জাগিয়া উঠিয়াছে। সাহজাদীর কক্ষে তখনও দীপ জ্বলিতেছে। বাঁদী গৃহমধ্যে যথাস্থানে সোনার তবকে মোড়া পান, সুবাসিত পানীয়, সল্‌মা চুম্‌কীর কাজ করা রুমাল স্বর্ণভৃঙ্গারের উপর সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। বাদসাজাদী সারারাত্রি এক দুর্ভাবনায় কাটাইয়া দিয়া উষার স্নিগ্ধ পরশনে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। শয্যাত্যাগের সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, প্রচারিণী তাহা ঘোষণা করিয়া গিয়াছে। মৃদুল প্রভাতী মলয়

সাহজাদী সুলতানার রেশম-বিনিন্দিত অবিন্যস্ত কেশপাশ উপাধানের উপর ছড়াইয়া দিতেছে, আর বাতায়ন পথে অরুণালোক আসিয়া তাহা স্বর্ণাভ করিয়া তুলিতেছে। সকলি নিস্তব্ধ, নিঝুম। সুবৃহৎ রাজপুরী যেন কার সতর্ক সঙ্কেতে নির্ব্বাক্ মুখ। পরিচারিকা দুইটী মৃদু কম্পিত ওষ্ঠ ও অঙ্গুলি তাড়নে ভাণ্ডারিণী করিমণ বিবির নিকট হইতে কাজ আদায় করিয়া লইয়া গেল। পাচক কৌশল দৃষ্টিতে কাবাব, কোপ্তা, কোর্ম্মা, পোলাও ইত্যাদির সুদীর্ঘ তালিকা সংগ্রহ করিয়া লইল। সকলি মন্থর, অচঞ্চল, সাহজাদী নিদ্রিতা—তাঁর শান্তির ব্যাঘাত করিলে গুরুদণ্ড অনিবার্য্য।

এমন সময়ে সে নীরব অভিনয় ভঙ্গ করিয়া কার বিষাদ করুণ কম্পিত স্বরলহরী ভাসিয়া আসিতে লাগিল। কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে সে অমৃতবর্ষী সঙ্গীতধারা প্রবলবেগে ছুটিয়া আসিল। হাব্সী দাস চম্‌কিয়া উঠিল, একবার অস্ত্রের দিকে চাহিল। প্রহরিণীর উত্তোলিত কৃপাণ কেবল একটা আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিল কিন্তু গান যেমনি ভাসিয়া আসিতেছিল, তেমনি উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠিতেছিল। গায়িকা বড় দক্ষতার সহিত গাহিতেছিল ;—

আজও সখি! কেন প্রিয়
এলনা এখন, (ও)
প্রভাত সূচনা হেরি
ভাঙ্গিল স্বপন!

কে সাধিল সুখে বাদ?
ফুরাইল মনোসাধ
ডুবিল আশার চাঁদ—
উদিছে তপন।

রজনী হইল ভোর,
সুখাইল ফুল ডোর,
কোথায় সেই মনচোর
হৃদয়রমণ?

মিলাইল সুখতারা,
বিহগে দিতেছে সাড়া,
নয়নে নির্ঝর ধারা
রহেনা গোপন।

একবার স্রোতের ন্যায় বন্যাবেগে সেই মনপ্রাণ দ্রবকরী গীতটী শেষ হইয়া গেল। বাঁদী আদেশিত কার্য্য করিতে যাইয়া দুদণ্ড দাঁড়াইয়া রহিল; পাচিকা রন্ধন-

শালার গবাক্ষ দিয়া এই নিপুণা সুরজ্ঞা রসিকার দর্শন-লাভের চেষ্টা করিতে লাগিল।

আবার সেই সুমধুর স্বর লহরী ভাসিয়া আসিতে লাগিল। এবার যেন অধিকতর সৌন্দর্য্য! অধিকতর মাধুর্য্য! স্বরের সে আবেগ স্পন্দনে, উচ্ছলিত মূর্চ্ছনায় সাহজাদী জাগিয়া উঠিয়া শয্যার উপর বসিলেন। তখনও মৃদু রেস্ ভাসিয়া আসিতেছিল :—

মিলাইল সুখতারা,
বিহগে দিতেছে সাড়া,
নয়নে নিঝর ধারা,
রহে না গোপন।

রাজকুমারী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। গোলাপবাসিত স্নিগ্ধ সলিলে মুখ প্রক্ষালন করিয়া তিনি একটু গাম্ভীর্য্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "এ বেসহবৎ গায়িকা কে?"

"বন্দেগী বেগম সাহেবা! শাস্তির জন্য প্রস্তুত! অপরাধ আমারই।"

প্রহরিণী উত্তর করিবার পূর্ব্বেই এক হাস্যাননা অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী দ্রুত সেই গৃহে প্রবেশ করিল। খোজা প্রহরী সেলাম করিয়া সরিয়া গেল। যে আসিল রাজ-

সংসারে সে অপরিচিত নহে। সুলতানা ওষ্ঠের হাসি ওষ্ঠে মিলাইয়া এই গুরুতর অপরাধিনীর প্রতি কঠোর দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিলেন ;—

"যে উদ্ধতা নারী সাহজাদী সুলতানার নিদ্রাভঙ্গরূপ গুরুতর অপরাধ করেছে, তার শাস্তি—আমার খাস কামরায় সমস্ত দিন নজরবন্দী।"

দণ্ডিতা রমণী এই আসন্ন দণ্ডাজ্ঞার কথা শুনিয়া সুর করিয়া গাহিয়া উঠিল—

"তোমারি প্রেমের ডোরে বাঁধা হ'য়ে রই—
তুহা মুখ পানে চাই, তব পানে ধেয়ে যাই
জীবনে মরণে বন্দিনী হ'য়ে রই—সই।"

সুলতানা হাসিয়া বলিলেন "এতদূর! ঠাণ্ডা কয়েদ!"

"আমার খসমের!"

"যে পুরুষ একটা শিকলপরা পাখীকে সহবৎ শিখাতে পারে না, তাকে গাধার পিঠে চড়িয়ে—"

এমন সময় একজন খোজা কুর্ণিশ করিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল, বলিল "গোলামের বেআদবী ধর্ত্তব্য নহে, একজন বৃদ্ধ জ্যোতিষী তোরণদ্বারে উপস্থিত!"

"জ্যোতিষী!" ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সুলতানা কহিলেন "তাঁকে সসম্মানে রাজপুরীর এক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে নিয়ে যাও।"

গোলাম চলিয়া গেল। আগন্তুক রমণী একটু দৃঢ়স্বরে বলিল "কোহস্থানের ভাগ্যাকাশ এখনও এত মেঘাচ্ছন্ন হয় নাই যে ভবিষ্যৎ জান্‌বার প্রয়োজন হবে!"

"না দেলেরা, তা নয়। এই তস্‌বির খানা নিয়ে যা। যদি গণৎকার সাহেব এ মূর্ত্তি কোন মহাপুরুষের ব'লে দিতে পারেন, তবে এই মতির হার তার পুরস্কার!"

সহচরী দেলেরা বিস্ময়ে গণ্ডে অঙ্গুলি স্থাপন করিল; হাসিতে হাসিতে ছবি লইয়া দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

একটী সুরম্য মঞ্চের উপর জ্যোতিষী বসিয়া আছেন। তেজ গাম্ভীর্য্যময় বয়স্থ বৃদ্ধ। কেশ পক্ক, দেহচর্ম্ম লোল কিন্তু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ-স্থির। হাতে স্ফটিকের মালা মুহুর্মুহুঃ ঘুরিতেছে। দেলেরা আসিয়া দেখিল, ভক্তিভাবে সেলাম জানাইল। বৃদ্ধ হস্ত বিস্তার করিয়া আশীর্ব্বাদ জানাইলেন। দেলেরা তস্‌বির খানি খোজার হাতে দিয়া বলিল "জনাব ফকির সাহেব! এ তস্‌বিরখানি—"

বৃদ্ধ হস্ত ঈঙ্গিতে নিবারণ করিলেন। অনেকক্ষণ ছবিখানির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কত অনুচ্চারিত যুক্তি তর্কের মীমাংসা হইল; পরে একটু হাসিয়া কহিলেন "সাহাজাদী উপযুক্ত পাত্রেই আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।"

দেলেরা চমকিয়া উঠিল। যে কথার আভাষ মাত্র রাজপুরীর কেহ জানে না, এ অপরিচিত বৃদ্ধ সে গুপ্তরহস্য কিরূপে উদ্‌ঘাটন করিল! সুতরাং গণনায় বৃদ্ধের অপরিসীম ক্ষমতা দেখিয়া দেলেরা দুইবার সেলাম করিল। বৃদ্ধ পুনরায় বলিতে লাগিলেন "এই ভাগ্যবান পুরুষ আর কেহ নহেন, মহাত্মা আর্ত্তজারিসের বংশধর ভাগ্যবান পারস্য সম্রাট।"

পার্শ্বের দ্বারে কর্ণ সংলগ্ন করিয়া সাহজাদী শিরী এ সব কথা শুনিতেছিলেন, তিনিও চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার চক্ষু যে প্রতারিত হয় নাই, ইহাই তাহার একমাত্র আনন্দের বিষয়। দেলেরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; জিজ্ঞাসা করিল "ফকির সাহেব এ মিলন কি সম্ভব?"

"রাশীচক্র বড় শুভ দেখিতেছি মা! মিলন নিশ্চয়ই। এ বিবাহে খোদা ভিন্ন কেহ বাধা দিতে পারিবে না।"

"ধন্যবাদ আপনার ফকিরীতে, শত ধন্যবাদ আপনার বিদ্যায়। সাহজাদীর এই ক্ষুদ্র উপহারটী প্রত্যাখ্যান করিলে চলিবে না"। এই বলিয়া দেলেরা একটী স্বর্ণপাত্রে সুলতানা প্রদত্ত মতিরমালাটী রক্ষা করিয়া জ্যোতিষীর সম্মুখে ধরিল। প্রথমে কতক আপত্তি জানাইয়া দেলেরার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বৃদ্ধ সেই বহুমূল্য হারটী গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পারস্য যখন শৌর্য্যে বীর্য্যে এশিয়া খণ্ডের প্রায় সকল রাজ্যকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাস্ত করিয়াছিল; তখন স্থপতি বিদ্যায় চীন মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রাচীন চীনের শিল্প সম্পত্তি অল্প ছিল না। চীনের বিশ্ব -বিশ্রুত প্রাচীর আজও সেই সহস্র সহস্র বৎসরের শিল্প নৈপুণ্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

চীনের পশ্চিমে কারা সহর, অতিত যুগের একটা প্রবাদ রাজ্য। কারার কারুকার্য্য খচিত পাথরের প্রাসাদ সকলে সে যুগের অনেক দেখিবার জিনিষ ছিল। কারার উত্তরে তর্‌খান পাহাড়, পশ্চিমে কীচ্‌চী হ্রদ, পাদদেশে তাবিস্‌ নদী। প্রতিভার বিকাশ করিবার জন্যই যেন স্বভাবের সহিত পরামর্শ করিয়া এই গুলি একত্র সংযোজিত হইয়াছে। অভ্র-ভেদী পর্ব্বতের অসংখ্য উপলখণ্ড কারাবাসী সাধক শিল্পির একটা বিশেষ অভাব দূর করিয়া রাখিয়া- । প্রাকৃতিক দৃশ্য যেন সৌন্দর্য্যময় চিত্র আঁকিবার একটা উপকরণ ফুটাইয়া তুলিত। নদীর কূলে দাঁড়াইয়া চিত্রকর তাহার মনোমত চিত্রে রং ফলাইত।

কারার এক ক্ষুদ্র পল্লীতে চিত্র বিচিত্র পাথরের গৃহে একজন ভাস্কর বাস করিত। সেই পল্লীতে প্রাসাদতুল গৃহের অভাব থাকিলেও সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থের অভাব ছি না এবং ফরহাদের স্বহস্ত রচিত সামান্য আবাসবাটীর যে একটু বিশেষত্ব ছিল। চিন্তাশীল ভাস্কর কঠিন প্রস্তরে উপর যে অসাধারণ শিল্পবিদ্যার পরিচয় দিয়াছে, তাহ দেখিলে অতি বড় নিন্দুককেও প্রশংসা করিতে হয় সৌধচূড়ে পাথরের চন্দ্র, পাথরের সূর্য্য, পাথরের তারক পাথরের আকাশ স্থান পাইয়াছে। গৃহে স্তম্ভের শাখা পল্লব বিশিষ্ট নানা জাতীয় পাথরের তরু শো পাইতেছে। অঙ্গনে কত ফুলের গাছ। কত কারুকার্য খচিত প্রস্তরময়ী পরি-মূর্ত্তি! প্রেম উন্মত্ত ভাস্কর পুষ্প রাজ্যে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিত! ফুলটী ফুটিলে তাহারি সহিত কথা বলিত, সুগন্ধে আকুল হইত খোদিত করিতে করিতে সেই পাথরের নির্ব্বাক মুখে চুম্বন করিতে যাইত। পাগলের প্রলাপ বুঝিয়া পাড়ার ছেলে মেয়েরা তাহাকে দেখিয়া একটু না হাসিয়া থাকিতে পারিত না কিন্তু সকলেই তাহার অনুগত ছিল—তাহাকে ভালবাসিত। সংসারে ফরহাদের কেহই ছিল না। যাহা উপার্জ্জন করিত তাহার অধিকাংশই শিশুদের পিষ্টক

ক্রয়ার্থে এবং দরিদ্রের দুঃখ যথা সামান্য প্রশমিত করিতে ব্যয় হইত ; তাই শিশুর ন্যায় অকপট চিত্ত ফরহাদ ভাস্কর শিশুর সঙ্গেই হাসিত, খেলিত, তাহাদের উপরই অভিমান করিত। সে বুঝিয়াছিল 'এ সংসারে যথার্থ হৃদয় নাই, অকৃত্রিম ভালবাসা নাই, একজনের জন্য একজন আত্মাহুতি দিতে পারে না।'

ফরহাদের আকাঙ্ক্ষা ক্ষুদ্র ছিল না। তাহার প্রাণের গভীরতা ছিল ; ভালবাসার পাত্র নির্ব্বাচন করিবার তাহার শক্তি ছিল। তাই কুটীল পৃথিবীর হাজারখানা সুন্দর মুখ পদ দলিত করিয়া, এতদিন অবিবাহিত জীবনে ফরহাদ তাহার প্রেম প্লাবিত হৃদয় শূন্য রাখিয়াছে। আয়ত চক্ষুর তীক্ষ্ণ ঈক্ষণ, নিবিড় নিতম্বের নর্ত্তন, অসামান্য রূপসীর কৃত্রিম হৃদয়দান দেখিয়া, সে ঘৃণায় দুঃখে প্রেমের অবমাননা বুঝিয়া খোদার নিকট ভয় ব্যথিত হৃদয়ে বলিত ;—

"ঐ দীপ্ত আকাশতলে যদি তুমি থাক—যদি তুমি শব্দময় হও—তবে শোন, ঐ মহামঙ্গলের দ্বার হ'তে শোন প্রভূ ! কি ছাড় এ রূপ, কি তুচ্ছ রমণী, কতটুকু তার মূল্য—কই সে সৌন্দর্য্যে তো দিকে দিকে জ্যোৎস্না বিচ্ছুরিত হয় না, কই তার ক্রোড়ে তো আমার আকুল পিপাসা

মিটে না—তবে সে কেমন রূপ? এমন একটা আলোর মালা আমায় তুমি দেখিয়ে দাও খোদা! যার দরশনে সুখ—যার অনুভবে স্বর্গ, যার চিন্তায় শান্তি, আর অম্লান যার ফুল্ল কুসুমগুলি!

নবম পরিচ্ছেদ

এই কি ইস্পাহান! এই সেই দিন যথায় পূর্ণ শান্তি বিরাজমান দেখিয়া আসিলাম। যথায় পারস্যের অপরাজেয় কীর্ত্তিপতাকা অনুকূল বাতাসে গর্ব্বভরে দুর্গের অত্যুচ্চ শিরোপরি পত্‌ পত্‌ শব্দে উড়িতেছিল, যে জাতীয় পতাকা রক্ষা করিতে শৌর্য্যশালী পারস্য বীরগণ সতত প্রস্তুত থাকিত, আজ যেন তাহা ম্লান হইয়া গিয়াছে। অভ্রস্পর্শী দুর্গচূড় হইতে যেন পারস্যের সে গৌরব নিশান পৃথিবীর বক্ষে ভাঙ্গিয়া পড়িতে বসিয়াছে।

দু' একজন সামন্ত রাজা মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রেমোন্মত্ত স্বপ্নালস সিংহকে হীনবল মনে করিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেকেই আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিতে ব্যস্ত হইয়াছে। রাজপুরুষগণ সুবিধা বুঝিয়া পদোন্নতির চেষ্টায় ঘুরিতেছে। দক্ষিণে জায়গীরদার আলী রোস্তম আপনাকে স্বাধীন বলিয়া প্রচার করিয়াছে, সুবাদার মবারক হোসেন পার্শী-পলিসে আধিপত্য লক্ষ্য করিয়াছে; সম্রাটের প্রবল শত্রু বাহরাম আপনাকে অর্দ্ধ পারস্যের

অধিপতি বলিয়া কর আদায় করিতেছে। একে একে সমস্ত সংবাদই বাদসাহের কাণে উঠিল কিন্তু শত্রুর বিরুদ্ধে সৈন্য অভিযান প্রেরিত হইল না। ধ্যান নিরত যোগীর ন্যায় তিনি নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই যেন তিনি মন্ত্রীবর সাঁপারের আগমন সংবাদ পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন। সম্রাট সর্ব্বদাই যেন কি চিন্তা করিতেন, নির্জ্জনে বসিয়া থাকিতেন। পারস্যের রাজনৈতিক আকাশ যে মেঘাচ্ছন্ন তাহা যেন তিনি বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। তাহার প্রখর রাজ-নৈতিক বুদ্ধি যেন কোন অলক্ষ্য মায়াবি আসিয়া হরণ করিয়া লইয়াছে। বিদ্রোহীদের অত্যাচার উপদ্রবে দরিদ্র প্রজার কষ্টের এক শেষ হইতেছে। দেশ জুড়িয়া ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। পৃথিবীর শত আর্ত্তনাদও প্রেমোন্মত্ত বাদসাহের তন্ময়তা ভঙ্গ করিতে পারিল না।

কয়দিনের মধ্যে সম্রাট একবারও দরবার গৃহে পদার্পণ করেন নাই। মন্ত্রী অনেক বুঝাইয়াছেন কিন্তু সবই বৃথা হইয়াছে। আজ কিন্তু না যাইলে নয়। পারস্যের অন্যতম মন্ত্রী গাজী এলাহী বক্স ও সেনাপতি আলী হোসেন রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। সম্রাট একটু চিন্তিত হইয়াছেন ; দুইটী বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারীর

অবসরের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যের যে বিশেষ ক্ষতি হইবে তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। বিশেষতঃ প্রধান উজির সাঁপারও এ সংকটের দিনে সুদূর কোহস্থানে !

হায় অভিসপ্তা ভালবাসা ! তোর মোহকরী কল্পনা এমন করিয়াই একজনকে আত্মবিস্মৃত করিয়া দেয়। তার কর্ত্তব্য, জ্ঞান, আত্মসম্মান, লোক লজ্জা সব যেন অন্তর্হিত হইয়া যায়। তোর ধ্যানে তোর চিন্তায় সে আপনাকে হারাইয়া ফেলে ; তার নিজস্ব কিছু থাকে না। তাই আজ বিচক্ষণ পারস্য সম্রাট তোর অমিত প্রভাবে সর্ব্বস্ব হারাইতে বসিয়াছেন। তুই যদি তাহাকে সে মোহিনী প্রতিমার কল্পনা হইতে দূরে রাখিতিস্, তাহা হইলে আজ পারস্যের বিপক্ষে ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ বাহরামের দন্ত অসি উত্তোলিত হইত কিনা সন্দেহ !

আজ দরবার গৃহ লোকারণ্য হইয়াছে। পাত্র মিত্র পদানুসারে যাঁহার যা আসন টানিয়া লইয়াছেন। বহুদিনের পর উৎপীড়িত গৃহস্থ রাজার কাছে—পিতার কাছে সন্তানের মত বেদনা জানাইতে আসিয়াছে। সৈন্যদল সুসজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, চারিদিকেই শৃঙ্খলা। মস্‌নদে পারস্যের অধিপ খস্‌রু সাহ অধিষ্ঠিত। সভামণ্ডপ নিস্তব্ধ।

সভাসদ্‌গণ প্রথমে কোন্‌ কথার উত্থাপন করিবেন তাহারি জন্য পরস্পরের মুখাবলোকন করিতেছিলেন। অর্দ্ধ দণ্ড যাবত তাহাদের মুখ হইতে কোন কথা বহির্গত হইল না দেখিয়া বাদসাহ স্বয়ংই কথা আরম্ভ করিলেন; বলিলেন "সুদক্ষ উজির গাজী এলাহী বক্স! আপনি কি অবসরের জন্য আবেদন ক'রেছিলেন?"

আসন হইতে উঠিয়া মন্ত্রীবর কুর্নীশ করিয়া এ কথার সমর্থন করিলেন।

সম্রাট পুনঃরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার অবসর গ্রহণের কারণ কি? যে অর্থ রাজ সংসার হ'তে পান তাতে কি আপনার সংকুলান হয় না? আচ্ছা আপনি যদি সন্তুষ্ট হন আমি আরও একশত মোহর আপনার বেতন বৃদ্ধি ক'রে দিলাম।"

এই বলিয়া সম্রাট স্বকীয় রাজ্য সংক্রান্ত পুস্তকে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু উজির বাধা দিয়া বলিলেন "জাঁহাপানার এ উদারতা প্রশংসার যোগ্য কিন্তু গোলাম দুঃখের সহিত বলিতেছে সে তাহার প্রত্যাশা করে না।" এই কথা বলিয়া কুর্নীশ করিয়া মন্ত্রীবর দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"তবে আপনি কি চান, উজির সাহেব?"

"শুধু অবসর।"

"কেন ?"

"জনাব! গোলামের গোস্তাকী মাপ্ করবেন, যেখানকার মন্ত্রীত্ব পদে মস্তক উন্নত ক'রে দাঁড়িয়েছি, সুমন্ত্রণা দাতা ব'লে প্রশংসা পেয়েছি, আজ সেখানে একটা মিথ্যা অপবাদ নিতে পার্ব্ব না। এখন গোলামকে অবসর দিলে সে যথেষ্ট মনে করবে।"

"বেশ। সৈন্যাধ্যক্ষ আলী হোসেন! তোমার পদত্যাগের কারণ ?"

বীরোচিত স্বরে আলী উত্তর করিলেন "জনাবের রাজকার্য্যে ঔদাসীন্য!"

সম্রাট একটু চিন্তা করিলেন, একটু ক্রুদ্ধ হইলেন, বলিলেন "তাহা হইলে আপনারা একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র ক'রেছেন; পদত্যাগ ভান মাত্র।"

মন্ত্রীবর গাম্ভীর্য্যের সহিত উত্তর করিলেন "জাঁহাপানা! এ বিশ্বস্ত হৃদয় নিমক-হারামী জানে না।"

"তবে আজ পারস্যের এই দুর্দ্দিনে পারস্যের কর্ম্মক্ষম রাজকর্ম্মচারীদের অবসর গ্রহণের তাৎপর্য্য কি ?"

সেলাম করিয়া সেনাপতি কহিলেন "জনাব! আপনার অনুমতি পাই নাই, তাই শত্রুর বৃদ্ধি হ'য়েছে।

রাজকার্য্যে অসাবধানতা যত অনিষ্টের মূল। তাই শ্রীভ্রষ্টা পারস্যের শোচনীয় পরিণাম দেখ্‌বার পূর্ব্বেই আমরা অবসর গ্রহণ কর্‌তেছি।" সম্রাট উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, বিশেষতঃ তাঁহার মস্তিষ্কের অবস্থা তখন তত ভাল ছিল না। তিনি স্থান ও সময় ভুলিয়া গিয়া বলিয়া উঠিলেন "কি বেয়াদব্‌! আমার শৈথিল্যে রাজ্যের এই পরিণাম? বিশ্বাসঘাতক শয়তান! এতদূর স্পর্দ্ধা! প্রকাশ্য দরবারে সম্রাটের অবমাননা? বন্দিকর এই দুই ঘৃণিত বিদ্রোহিকে।"

অবনত মস্তকে প্রভুভক্ত রাজকর্ম্মচারীদ্বয় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহারা বাদসাহের উন্মত্ততা দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন। বাদসাহের চৈতন্য সম্পাদনের জন্যই তাঁহারা এই মিথ্যা অভিনয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন কিন্তু তার শোচনীয় ভবিষ্যত দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। আজ্ঞাবাহী সম্রাটের শরীর রক্ষীগণ এই দুই অপরাধীকে বন্দী করিতে অগ্রসর হইল! এমন সময় কে যেন জলদ-গম্ভীর স্বরে সেই সুশৃঙ্খল সভাগৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দ্রুত অগ্রসর হইতে হইতে বলিল "অপেক্ষা কর। রক্ষীগণ! একটু অপেক্ষা কর। বাদসাহের কাছে আমার আর্জ্জি আছে।"

সকলেই বিস্মিত হইয়া উঠিলেন "শমন কাহাকে স্মরণ করিয়াছে" "কাহার জীবনের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে" ইত্যাদি অলীক জল্পনা অনেকেই করিতে লাগিলেন। অগ্রগামী রক্ষীগণ ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। সম্রাট সাশ্চর্য্যে সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন। অপরাধীদ্বয়ও মহাসংশয়ে পতিত হইলেন!

সে জনস্রোত মথিত করিয়া এক গলদঘর্ম্ম বৃদ্ধ সম্রাটের সম্মুখে আসিয়া পুনঃ পুনঃ কুর্নিশ করিতে লাগিলেন; বাদসাহ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সিংহাসন হইতে অবতরণ করিলেন; বলিলেন "ফিরে এসেছ? প্রভুভক্ত কর্ত্তব্য-পরায়ণ বীরাগ্রগণ্য উপকারী বন্ধু সীপার! তুমি ফিরে এসেছ?"

তস্‌লীম জানাইয়া সীপার উত্তর করিলেন "জাঁহাপানা! গোলাম কাজ হাসিল ক'রে আবার পারস্যে মুখ দেখা'তে এসেছে। যদি কার্য্য উদ্ধার কর্‌তে না পার্‌ত, তবে এ বৃদ্ধকে পারস্যের তরুলতাও বোধ হয় দেখ্‌তে পেত না।" সম্রাট পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যাহা করিতে যাইতেছিলেন তাহা ভুলিয়া গেলেন; বলিলেন "আনন্দ! আনন্দ! আজ এক মহা-উৎসবের দিন।"

ধীরে ধীরে সীপার উত্তর করিলেন "না সম্রাট! আজ আনন্দের দিন নয়, আজ আনন্দের সমাধি।"

"একি কথা উজির সাহেব?"

নির্ভীকভাবে সীপার উত্তর করিলেন "রাজধানীতে পদার্পণ ক'রে জেনেছি, পারস্যের আজ আনন্দের দিন নয়, আনন্দের অবসর নাই। আজ বড় গভীর অনুতাপের দিন।"

পরে নতজানু হইয়া সীপার কহিতে লাগিলেন "হজরত! পূর্ব্ববর্ত্তী বাদসাহগণ যে মস্‌নদে বসে বংশ গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখে গিয়েছিলেন, আজ একি দেখ্‌ছি সম্রাট! কি শুন্‌ছি! শৃগাল, মূষিক, সিংহ শাবকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'র্‌তে মনস্থ করেছে, আর আপনি নিশ্চেষ্ট। আবার রাজসভায় এসে যা দেখ্‌ছি, দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছি! প্রভুভক্ত বৃদ্ধ এলাহী বক্স ও বীরবর আলী হোসেন বিদ্রোহীতার ঘৃণা অপবাদে প্রকাশ্য রাজসভায় অপমানিত হ'চ্ছেন। উত্তম পুরস্কার! জীবন দিয়ে যারা রাজার সম্মান, দেশের সম্মান রক্ষা ক'রেছেন, তাদের প্রতি যোগ্য ব্যবহার করা হ'চ্ছে।"

লজ্জায় সম্রাটের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল, নিজ কৃত ব্যবহার স্মরণ করিয়া মর্ম্মাহত হইলেন; বলিলেন

"আমার মস্তিষ্কের অবস্থা ভাল ছিল না। আপনারা আমার এ ব্যবহার হৃদয়ে স্থান দিবেন না।"

রক্ষীরা অপরাধীদ্বয়কে সেলাম জানাইয়া সম্রাটের পার্শ্বে আশ্রয় লইল। মন্ত্রী ও সেনাপতি কুর্নিশ করিয়া নিজ নিজ আসন গ্রহণ করিলেন।

সীপার বলিতে লাগিলেন "সম্রাট যুবক, অল্প বয়স্ক। পারস্য তোমাদের। পারস্যের দুর্দ্দিনে তোমাদের দুর্দ্দিন। বাদসাহের কথায় যদি ক্ষুণ্ণ হ'য়ে থাক, আমি পারস্যের রাজস্ব-সচীব ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।"

সকলেই আনন্দে হর্ষধ্বনী করিল। সম্রাট অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে এই বৃদ্ধ উজির সীপারকে আপনার সিংহাসন পার্শ্বে টানিয়া লইলেন। সীপার খোদার নাম লইয়া সম্রাটকে লাখ্ লাখ্ তস্‌লিম জানাইয়া এই অপ্রত্যাশিত সম্মান গ্রহণ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

সে কি সৌন্দর্য্য ফরহাদের ক্ষুদ্র কুটীরে! সে কি আলোক দরিদ্র ভাস্করের পবিত্র হৃদয়ে! নির্জ্জন স্বভাবের নিষ্কাম সাধক সাধনা লইয়াই ব্যস্ত। এ জগতে নিয়মের নিগড়ে সে আবদ্ধ নয়; নিয়ম দিয়া তাহাকে বুঝি বাঁধা যায় না—এমনি সে চঞ্চল, এমনি সে উন্মত্ত। তাহার হৃদয় মধ্যে যে ভাব স্রোতস্বিনী কুলু কুলু করিয়া বহিয়া যাইতেছে তার স্বর গাম্ভীর্য্যে সে আপনি মুগ্ধ। আপনার ভাবে আপনি মগ্ন, আপনার চিন্তায় আপনি আত্মহারা! কি যে তার ধ্যান, কি যে তার উদ্দেশ্য কে জানে? কেই বা সেই পাগল মনের দুর্ব্বোধ্য ভাব জানিতে চেষ্টা করিয়াছে। দুনিয়ার স্বার্থ-কলুষিত নিশ্বাস তার অঙ্গ স্পর্শ করে নাই। সে বড় সুখী—পৃথিবীর কাহাকেও সে ভালবাসে নাই। সে ভালবাসে সন্ধ্যার মুক্ত আকাশকে—সে হৃদয় পেতে দেয় বনের ছোট ছোট হরিণ শিশুগুলিকে, আর অভিমান করে দুরন্ত বর্ষার মেঘখণ্ডের উপড়ে।. তার রাজত্ব আপনার ক্ষুদ্র কুটীরটী!

সেখানে শত্রুর অভিযান আসে না। সে চিরজয়ী, বিজয় শ্রী কাহারও হাতে তুলিয়া দিতে হয় না।

নীরব ফরহাদ নীরবে এক মানস-প্রতিমা গঠন করিল! সে স্বর্গীয় মূর্ত্তির, সে স্বর্গীয় ভাবের তুলনা হয় না। ঘুমাইতে ঘুমাইতে উঠিয়া বসিয়া পায়ের নখর নির্ম্মাণ করিয়াছে, খাইতে খাইতে চোখের কোণে তীর যোজনা করিয়াছে, আর পথ চলিতে চলিতে ফিরিয়া আসিয়া গণ্ডের পার্শ্বে একটা তিল বসাইয়া দিয়াছে। তিলে তিলে পলে পলে তাহার মানস-প্রতিমার সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। ফরহাদ আঁকিয়াছে, ফরহাদই দেখিয়াছে। যেমনটী ভালবাসে তেমনটী করিয়াই গড়িয়াছে, তাই নিখুঁত হইয়াছে। যে আকাঙ্ক্ষা তাহার হৃদয়ের মধ্যে জাগিতেছিল, যে ইচ্ছা সে গোপনে পোষণ করিতেছিল, যাহাকে দেখিবার জন্য সে আকুল হইতেছিল, দুনিয়ায় তাহার সন্ধান না পাইয়াই, ভাবুক ভাস্কর চিত্ররাজ্যের দুর্লভ এই মানস-প্রতিমাটী অঙ্কিত করিল! আত্মহারা শিল্পী শিল্প সম্ভারে মানস-প্রতিমার অঙ্গ ঢাকিয়া দিয়া নীরবে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিল!

দিনের পর দিন যাইতেছে। বসন্তে ফরহাদের মানসীর প্রাঙ্গনে মধু-উৎসব—বর্ষায় মেঘের গান। কত

মান অভিমান, হাস্য পরিহাস, প্রত্যহই তাহার কুটীরে দেখা যায়। সে নিজেই হাসে, নিজেই মান করে, নিজেই কাঁদে।

সেদিন জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। ফরহাদ তখনও ঘুমায় নাই। গৃহের দ্বার উন্মুক্ত—বাতায়ন উন্মুক্ত, আর মস্তকের উপর সুনীল আকাশ উন্মুক্ত। চত্বরের ফুলের গন্ধ গৃহময় ভাসিয়া আসিতেছে। ফরহাদ এক মনে তাহার মানস-প্রতিমার বিষয় ভাবিতেছে। তাহার চক্ষু বহিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু গড়াইতেছে। এমন করিয়া অর্দ্ধরাত্র অতীত হইয়াছে, ফরহাদের তন্ময়তা দূর হয় নাই। অনেকক্ষণ পরে তাহার চেতনা সঞ্চার হইল; প্রভাতের পাখীর ডাকে যেন চমক ভাঙ্গিল। নিশাবসানের আর দেরী নাই, সে বড় কাতর, বড় অবসন্ন—তাই একবার বলিল "দেবি! এতরূপ নিয়ে আমার সাম্‌নে দাঁড়ালে, আমি যে ভস্ম হ'য়ে যাব; ঐ শুন ভোরের বিহঙ্গম ডেকে গেল, তুমি অদৃশ্য হও—অদৃশ্য হও, নতুবা দর্শনের আকাঙ্ক্ষা যাবে না, দেখ্‌তে দেখ্‌তেই পোড়া চোখ্‌ ক্ষয় হ'য়ে যাবে।" কেই বা শুনিল, কেই বা লুকাইয়া গেল, ফরহাদ বড় ক্লান্ত হইয়া মাটীর উপর শুইয়া পড়িল।

এমনি করিয়া ফরহাদ তাহার পবিত্র জীবন অতিবাহিত করিতেছিল। পাড়ার বালক বালিকারা তাহার কণ্ঠের হার। সর্ব্বাপেক্ষা সে আদর করে গরীবের মেয়ে সাত বছরের সল্‌মাকে। সল্‌মা রোজ আসে, আজও আসিল, চিন্তামগ্ন ফরহাদের কোলের উপর গিয়া বসিয়া পড়িল। ফরহাদ সল্‌মার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল "সল্‌মা! আমাকে ভালবাসিস্, তুই ভালবাস্‌তে জানিস্?"

সল্‌মা হাসিয়া আকুল! সে সরলভাবে উত্তর করিল; "কে বলে জানিনা? আমি আমার ছোট ময়ুরটীকে ভালবাসি, ভাইজানের হরিণটীকে ভালবাসি, পাড়ার মাশু আমার সই—তাকে ভালবাসি কিন্তু তোমাকে সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসি।"

ফরহাদ আকাশের দিকে চাহিয়া আবার কি ভাবিতে লাগিল। সল্‌মা তাহার কোলে বসিয়া নানা উপদ্রব করিতেছিল। ফরহাদ সস্নেহে বালিকার হাত দুটী ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল "চিরকাল বাস্‌বি?"

সে উত্তর করিল "হুঁ! তুমি যদি আমায় একটা পাথরের পরী খুদে দাও, আমি তোমায় রোজ ভালবাস্‌ব। দিবে ভাই?"

ফরহাদ হাসিয়া বলিল "দূর পাগ্‌লি! জানিস্ পরীরা তোর মত ছোট্ট ছেলে মেয়ে পেলে নিজের দেশে উড়িয়ে নিয়ে যায়। সে দিন চীনের মন্ত্রীর মেয়েকে নিয়ে গেছে, শুনিস্‌নি বুঝি?"

ভয়ে সল্‌মা কাঁপিয়া উঠিল। ফরহাদ তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল "তোর এমন ফুলের মত প্রাণ, তুই কেন ফুল ভালবাসিস্ না?"

"কোন ফুল বেশী ভালবাস্‌তে জানে ভাই?"

"যে ফুল এখনো ফোটে নাই, মানুষের স্পর্শে যে মলিন হয় নাই, যে কিছু বোঝে না, খোদা যাদের দুনিয়ায় সুবাস বিতরণ কর্ত্তেই পাঠিয়েছেন! যারা দিয়েই সুখী। এই তোর মত নির্ম্মল সদ্য ফোটা ফুল।"

সল্‌মা ভালরূপে কিছু বুঝিতে পারিল না কিন্তু ফরহাদের সঙ্গে সেও হাসিয়া খুন হইল।

ফরহাদের হৃদয় যে কত উচ্চ। কত মহৎ, কি যে তাহার সরলতা, প্রতি কার্য্যে তাহা ফুটিয়া উঠিত। জগতের দ্বারে দাঁড়াইয়া স্বর্গীয় প্রেমের মাধুর্য্য মানবকে দেখাইবার জন্যই সে আসিয়াছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রাজ অন্তঃপুরের একটী সুসজ্জিত কক্ষে সম্রাট খসরু মখ্‌মলের শয্যার উপর অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় অতীত ভবিষ্যতের কত কথাই ভাবিতেছিলেন। আর অদূরে বুদ্ধিমতী পরিচারিকা সেরিনা সম্রাটের এ মনোভাব সম্যক বুঝিতে না পারিলেও তিনি যে একটা বিশেষ চিন্তায় মগ্ন আছেন তাহা ঠিক করিয়া লইয়াছিল। সেরিনা একটু অগ্রসর হইয়া মেহেদী রঞ্জিত করতল কপালে স্পর্শ করতঃ বলিল "বন্দেগী জাঁহাপানা!"

সেরিনা সম্ভ্রান্তবংশীয়া, পিতৃহীনা। তাই বাদসাহের রংমহলের প্রধানা পরিচারিকার পদ লাভ করিয়াছে। সম্রাট তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। অনুগতা সেরিনাও বাদসাহের সুখে হাসিত, দুঃখে মর্ম্মান্তিক জ্বালা অনুভব করিত, মুখ লুকাইয়া অশ্রু মুছিত। সেইজন্য সম্রাট তাহার সহিত পরম আত্মীয়ার মত ব্যবহার করিতেন। আপনার হৃদয়ে যখন প্রলয়ঙ্করী ঝটিকা বহিত, মরমের ব্যথা লুকাইয়া রাখা অসহ্য হইত, তখন তিনি এই স্নেহ

প্রবণহৃদয়া সেরিনার কাছে অকপটে সকল কথা বলিয়া অন্তরের ভার লাঘব করিতেন। সেরিনা শিক্ষিতা নবীনা, সদা হাস্যময়ী ; তাই সে যেখানে যাইত সে স্থানটাই আনন্দময় হইয়া উঠিত। সেরিনা আসিয়া বলিল "বন্দেগী জঁাহাপানা!"

খসরু সাহের বিষাদিত মুখমণ্ডল সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আমার নসিব, সেরিনা বিবির এমন সময় দর্শন পেয়েছি।"

মুখ অবনত করিয়া সরলা সেরিনা ওড়নার অগ্রভাগ কণ্ঠে জড়াইতে জড়াইতে সলজ্জভাবে উত্তর করিল "সে কি জঁাহাপানা! আপনি দুনিয়ার মালিক, আমি নগণ্যা বাঁদী মাত্র! বাদসাহের আদেশ সেবিকা তো কখনও অমান্য করে না।"

"না সেরিনা, সে সব কথা আমি ভুলে যাই নাই। এ সঙ্কটের দিনে রাজ্য জুড়ে আমার শত্রু হ'য়েছে ; দেখ সেরিনা! তুমি যেন বিশ্বস্ততা হারিও না।"

সেরিনা ঊর্দ্ধ দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল "জনাব! বাঁদী সে খবর পেয়েছে, পারস্য সম্রাট যদি নিঃসন্দেহে রাজ অন্তপুরের ভার আমার হাতে দিয়ে যান, জয়ী হ'য়ে এসে দেখ্‌তে পাবেন, আপনার সাধের রংমহলের একখানা

পাথরও স্থানচ্যুত হয় নাই। দেশব্যাপী ষড়যন্ত্রে সেরিনা ভয় করে না। বাঁদীর ভয় পাছে সে বাদসাহের করুণা হ'তে বঞ্চিতা হয়।"

সম্রাট একটু চিন্তা করিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন "সেরিনা! একটা কথা বল্‌ব?"

"কি কথা জাঁহাপানা?"

"আজ যদি আমার ভগ্নী থাক্‌ত—না—"

"জনাব! বুঝ্‌তে পেরেছি সে আমার মত হ'ত, তাকে অকপটে মনের কথা বল্‌তে পার্‌তেন।"

"তোর অনুমান সত্য সেরিনা।"

আনত মুখে সেরিনা কহিল "ক্ষুদ্র বাঁদী আমি, সে স্পর্দ্ধা কি ক'রে করব জাঁহাপানা? আমার মনে হয়—" বস্ত্রপ্রান্তে চক্ষু মুছিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল "জাঁহাপনা! সম্রাট! আপনিই আমার ভাই। যে ভাই আমার স্বর্গে চলে গেছে, সেই ভাই বুঝি সম্রাটের নাম নিয়ে পারস্যের মস্‌নদে ব'সেছে।"

ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া সেরিনা কাঁদিতে লাগিল; বাদসাহ এই সংসার সাহারায় সমবেদনার একটা অকৃত্রিম উৎস দেখিয়া বড়ই তৃপ্তি লাভ করিলেন; বলিলেন "তবে শোন্‌ ভগ্নি!"

একটু সংযত হৃদয়ে সেরিনা কহিল বলুন "জাঁহাপানা !"

"সে কি সেরিনা, আমি যে তোর ভাই ! সম্রাট—জাঁহাপানা বল্‌বার আমার হাজার হাজার লোক আছে কিন্তু ভাই সাহেব বল্‌বার লোক ত জগতে খুঁজে পাই না।"

"তবে বলুন ভাই সাহেব !"

সম্রাট সেরিনার হাত দুইটী ধরিয়া পার্শ্বের আসনে বসাইয়া দিলেন, বলিলেন "সেরিনা ! আমি একজনকে ভাল বেসেছি, তার জন্য আমি সব ভুলে গেছি, রাজ-সিংহাসন পর্য্যন্ত হারাতে বসেছি। জানি না খোদা এর পরিণাম কি লিখেছেন।"

"কে সে ভাগ্যবতী জাঁহাপানা !"

"আবার — ?"

"ভাই সাহেব !"

"সে অনেক দূরে—সুদূর কোহস্থানে। তাঁকে পা'বার আশায়, তাঁর চিন্তায় আমি আপনাকে হারিয়ে ফেলেছি।"

"ভাই সাহেব কি তার মনোভাব জেনেছেন ? পারস্য সম্রাটকে কি তিনি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত আছেন ?"

"তাঁর মনের ইচ্ছা জান্‌বার জন্যই সীপার এ দীর্ঘকাল কোহস্থানে ছিল। কৌশলী বৃদ্ধ সুসংবাদ নিয়ে ফিরে এসেছে।"

"একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব ?"

"সেরিনা! ভগ্নি! তোমার আমায় কথা বল্‌তে সঙ্কোচ কি ?"

"তবে জিজ্ঞাসা করি হৃদয়ের আদান প্রদানেও কি রাজনৈতিক কুটিলতা ?"

"না—সেরিনা, সীপার বলেছে, সে আমায় স্ব ইচ্ছায় আত্মদান ক'রেছে।"

"তবে ভাল।"

"সেরিনা, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলুম—"

সম্রাটের স্বরে একটু চাঞ্চল্য দেখিতে পাওয়া গেল।

সেরিনা স্বাভাবিক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল "কি ভাই সাহেব!"

নতমুখে বাদসাহ উত্তর করিলেন "খোদার মর্জ্জি, যদি তাকে এই রংমহলে আন্‌তে পারি ?"

"আমি তা হ'লে বেগম সাহেবাকে কুর্নীশ করি—বাঁদীর জীবন স্বার্থক হয়, কিন্তু—"

"কিন্তু কি সেরিনা ?"

সন্দেহ দৃষ্টিতে সম্রাট একবার সেরিনার দিকে চাহিলেন।

"এ দুর্দ্দিনে নয়। রাজ্য জু'ড়ে হাহাকার পড়ে গেছে। সন্তান তুল্য প্রজাগণ বিদ্রোহীদের উপদ্রবে কত লাঞ্ছনাই না ভোগ কর্‌ছে। যে বাহ্‌রাম আপনার অনুগ্রহে উন্নত, সে বিশ্বাসঘাতক নিমক হারাম আপনাকেই গ্রাস কর্‌তে উদ্যত। এর প্রতিবিধান ক'রে, রাজ্যে শান্তি স্থাপন করে, দেশবাসী দরিদ্র প্রজার শুভ আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে তার পর প্রেমের চিন্তা কর্‌লে ভাল হয় না কি ভাই সাহেব ? যদি প্রণয়ে উভয়ের হৃদয় এক সূত্রে গাঁথা হ'য়ে থাকে, তবে এ কাল যুদ্ধের অবসানে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। ভাই সাহেব, প্রথমে প্রণয়ের পরীক্ষা হউক, কে কার জন্য কতটুকু স্বার্থ ত্যাগ কর্‌তে পারে, আগে তার পরীক্ষা—তার পর শুভ মিলনে বিলম্ব হ'বে না।"

"ঠিক কথা সেরিনা! ভগ্নীর মত কথা বলেছিস্। তোর যুক্তিই আমি গ্রহণ কর্‌লাম। এ সঙ্কটের দিনে রমণী-চিন্তার সময় নহে।"

এই বলিয়া সম্রাট নীরবে ফরসীতে মুখ লাগাইয়া আলবোলার ধূম পান করিতে লাগিলেন। সেলাম জানাইয়া সেরিণাও গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মধু মাস। নবীন বসন্তের আনন্দ অভিনন্দন। বৃক্ষে বৃক্ষে নবীন কিসলয়। লতায় লতায় নব আলিঙ্গন। নব শাখা'পরি বসিয়া নবোদ্ভিন্ন কুসুমের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, নবীনা পিকরাণী সারাটী বৎসরের পর সঙ্গীত শাস্ত্রে যেন অধিকতর অভিজ্ঞা হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কমনীয় কণ্ঠের স্বর বনভূমি মাতাইয়া তুলিয়াছে। বসন্ত আসিয়াছে, তাই সঙ্গে সঙ্গে বসন্তের লতাও মুঞ্জরিত হইয়াছে। অনুরাগের মৃদু পরশনে অভিমান টুটিয়া গিয়াছে। নবোঢ়া বেলা চামেলী গোলাপ কাবেরী হেনা স্বামীর আকুল আহ্বানে একবার চকিতে চাহিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিয়াছে। চতুর বসন্তও অবগুণ্ঠনের বাধা জোর করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

মধ্যাহ্ন। স্বভাবের আনন্দ কল্লোল থামিয়া গিয়াছে। মার্ত্তণ্ডের অনলবাহী রশ্মিজালে কোমলা প্রকৃতি বিদগ্ধা হইতেছে। দ্বিপ্রহরের পথ জনশূন্য। মানব সমাজে একটুও চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয় না। কেহ

ঘুমাইতেছে, কেহ বসিয়া বসিয়া জেলেখা কেহ বা সাহনামা পাঠ করিতেছে। আর একত্র কয়েক জন মিলিয়া কোথাও বা আদিযুগের কথা লইয়া তর্ক আরম্ভ করিয়াছে। ধনীর গৃহ সুগন্ধি বসুরাই গোলাবে অভিষিক্ত হইয়া তপনের উগ্রতাপ কিয়দংশ প্রশমিত করে। আর দরিদ্র— সে তার পর্ণকুটীরে নির্ব্বিবাদে বড় শান্তির সহিত অঙ্গ ঢালিয়া দেয়। ইহাই স্বভাব! ইহাই সৃষ্ট জগতের অবোধ্য রহস্য! ইহাই সেই বিশ্ব নিয়ন্তার অপূর্ব্ব কৌশল!

রাজপুরীর দুই চারি জন মিলিয়া এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া একটা আমোদ আহ্লাদের, হাস্য বিদ্রূপের অভিনয় আরম্ভ করিয়াছে। সহচরীদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধেও রাজনন্দিনী সে আমোদ উৎসবে যোগ দেন নাই। তাঁহার মনের অবস্থা ভাল নয়, ইহাই সাদর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার একমাত্র প্রতিবন্ধক। সহচরীরা ডাকিয়া ডাকিয়া হয়রান হইয়া গিয়াছে। চিত্তবিনোদনের অনেক চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু সাহজাদীর ওষ্ঠে হাসির রেখা ফুটাইতে পারে নাই।

এইরূপে দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে। প্রণয়ের বেগও ভাদ্রের নদীর ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত

হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মৃতি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কল্পনা একটীর পর একটী করিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া যাকে 'ভালবাসি' তার মূর্ত্তিটী বড় দৃঢ় করিয়া আঁকিয়া দিতেছে। হাসিতে তাহারি প্রমোদ সঙ্কেত, অশ্রুকণায় তাহারি অভিমান, স্বপনে তাহারি মৃদু পরশন, ক্ষণে ক্ষণে অনুভূত হইতেছে। সাহজাদী একটা বিশাল রাজ্যের লোক নিয়ন্ত্রী হইয়াও, এত বড় একটা রাজ্যের উপর আধিপত্য করিয়াও, হৃদয়ের উপর আধিপত্য করিতে পারেন নাই ; স্বভাবের সামান্য কম্পনও তাঁহাকে অনুভব করিতে হইতেছে। হায়রে ফুল-ধনু ! তোর পুষ্পশর বিদ্ধ হইয়া অহরহ যে শিহরন হৃদয়ে জাগিতে থাকে, তাহার নিকট নির্ম্মম নিষাদের বাণের তীব্রতাও পরাজিত !

চিন্তামগ্না সুলতানা শিরী মর্ম্মর প্রস্তরের গৃহতলে বসিয়া, হীরক মণ্ডিত সুবর্ণ তুলিকাটী লইয়া, করিমন বেগমের একটী আদর্শ চিত্রের অনুকরণ করিতেছিলেন। সাহজাদী চিত্র বিদ্যায় সুনিপুণা। তাঁহার হাতের কাজ যে দেখিত প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিত না। বড় মনঃসংযোগে ধীর তুলিকায় সুন্দরী তাঁহার চারুহস্তে চিত্রের কাজ করিয়া যাইতেছিলেন। অঙ্কণ শেষ হইল। সাহজাদী তুলিকা রাখিয়া কপালের বিন্দু স্বেদবারি রুমালে

মুছিয়া ফেলিলেন কিন্তু কি আঁকিতে কি হইয়া গেল! আদর্শ চিত্র গড়িতে গিয়া এক সুন্দর যুবার প্রতিকৃতি গড়িয়া ফেলিয়াছেন। এত ভুল! এত মন প্রাণের অনৈক্য! সুলতানা ছবিখানির দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া বলিলেন "আমি ফুল আঁক্‌তে আঁক্‌তে তোমার ছবি এঁকেছি, এমন ভুল রোজই করি। ফুলের মালা নিয়ে খেলা করতে করতে তোমার তস্‌বিরের গলায় পরিয়ে দিই; তোমার তস্‌বির দেখ্‌তে দেখ্‌তে তারি সাথে মিশে যাই। এমন ভুল রোজই হয়।"

"তস্‌লিম বেগম সাহেবা! বান্দা ফিরে এসেছে।" নেপথ্যে খোজা আমিন বক্‌স সাহাজাদীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা কয়টী বলিল। আমিন বক্‌স অনেক দিনের ভৃত্য। নিজের বুদ্ধিমত্তা ও অকপটতার গুণে আমিনের ভাগ্যে অন্তপুরের প্রহরীদের সর্দ্দার পদ লাভ ঘটিয়াছে। সুলতানা তাহাকে বিশেষ কার্য্যে পাঠাইয়াছিলেন, তাই সে সময় অসময় না বুঝিয়া বাদসাজাদীর খাস কামরার সম্মুখে আসিতে সাহসী হইয়াছে। শিরী হাতের ছবিটী সাবধানে রাখিয়া বাহিরে আসিলেন; অতি ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমিন বক্‌স?" বার বার কুর্ণিশ করিয়া খোজা উত্তর করিল "হুজুর!"

"কি দেখে এলে ?"

একটা প্রস্তর দিয়া যেন হৃদয়ের স্পন্দনটা চাপিয়া রাখিয়া সুলতানা আবেগভরে এই কথা কয়টী উচ্চারণ করিলেন।

"আমি ঘোড়া ছুটিয়ে পারস্যের সীমান্তে মাত্র দুই দিনে পৌঁছেছিলাম। ওমরাহ পুত্রকে যথা সময় পত্র দিয়েছি।"

"তিনি জবাব দিয়েছেন ?"

"হাঁ। এই যে লেফাফা। আরও বলে দিয়েছেন ভগ্নিকে ব'লো পারস্যের অবস্থা এখন ভাল নয়। বিদ্রোহীদের আক্রমণে পারস্যের অনিষ্ট আশঙ্কা আছে। পারস্য সম্রাট চতুর্দ্দিক হ'তে আক্রান্ত হ'য়েছেন। এ অবস্থায় যা ভাল হয় তিনি বিবেচনা কর্‌বেন।"

সাহজাদী স্থাণুর ন্যায় ভৃত্যের মুখে কথাগুলি শুনিলেন; ভৃত্যকে বিদায় দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার অর্গল বদ্ধ করিলেন। রেশমী লেফাফা উন্মোচন করিয়া তিনি সেই পত্রখানা পাঠ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; ঘৃণায় ক্ষোভে তিনি আত্মহারা হইয়া গেলেন। তিনি শয্যার উপর শুইয়া পড়িলেন; উপাধানের তলে মুখ লুকাইয়া নীরবে

অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। আবার উঠিলেন, আবার পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

সুলতানার এক দূর সম্পর্কীয়া পিতৃব্য পুত্র পারস্যের ওমরাহ; তাহারই নিকট পারস্য রাজ্যের সহিত কোহ-স্থানের মিত্রতা করিবার ভান করিয়া সাহজাদী পারস্যের অবস্থা ও সম্রাটের চরিত্রের কিছু জানাইতে বলিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে তিনি এই পত্র লিখিয়াছেন।

হুয়াল গণি।

ভগ্নি!

বহুদিবস পরে তোমার পত্র পাইয়া বড় খুসী হইলাম। তোমার তবিয়ৎ ভাল আছে জানিয়া আনন্দের সীমা রহিল না। আমায় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ এবং যে বিষয়ে আমার মত চাহিয়াছ; আমার বিবেচনায় পারস্যের এই দুরাবস্থায় এ সম্বন্ধের প্রয়োজন নাই, কারণ রাজ্যে অন্তর্বিরোধ দেখা দিয়াছে। সামন্তরাজ বাহরামের সহিত পূর্ব্ব সীমান্তে সম্রাটের যুদ্ধ বাঁধিয়াছে। এ যুদ্ধে সম্রাট সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ, কারণ দুই একজন করিয়া স্বার্থপর করদ ভূপতি বাহরামের সহিত যোগদান করিয়াছে। রাজ্য জুড়িয়া এক বিরাট ষড়যন্ত্র, বাদসাহের মনের অবস্থা ভাল নয়। পরোক্ষে

জনরব কোন এক রাজনন্দিনী তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছেন। বাদসাহ তাঁর চিন্তায় আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। তুমি বুঝিয়া আমায় পুনঃ জানাইও। ইতি

মবারক।

পত্রটী আদ্যন্ত পাঠ করিয়া শিরীর মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। এক মূহূর্ত্তে তাঁহার সমস্ত সুখ স্বপ্ন শেষ হইয়া গেল। দারুণ নিরাশায় তিনি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন। সংশয়ে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পারস্যের পূর্ব্বসীমান্তে পল্লীরাণী মুরিবেন্সু, ঘুমন্ত সৌন্দর্য্যের স্বপ্নালস মূর্ত্তি। গ্রাম্য সম্পদে গর্ব্ব করিবার তাহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। নির্জ্জন প্রকৃতির সরল আস্য ও স্ফুরিতাধরের বিচ্ছুরিত হাস্যকণা সেই ক্ষীণা পল্লীচিত্রটীকে বড় মধুর করিয়া তুলিয়াছিল। যদিও কোন বিপুলতোয়া প্রবাহিণী মুরিবেন্সুর মধ্য দিয়া গমন করিয়া তাহার বক্ষে পণ্য ঐশ্বর্য্যের কোন প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব রাখিয়া যায় নাই, তথাপি আত্মাভিমানিনী নিজের বক্ষ ধারায় সারা গ্রামের তনয় তনয়ার মুখে প্রচুর নীর ঢালিয়া দিতে পারিত। অভাবের ভীষণমূর্ত্তি, দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া, সন্তানের ম্লান কাতর মুখ, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়া 'মুরিবেন্সুর' আত্মসম্মানের লাঘব করে নাই। তাহার গৃহে গৃহে ছিল কেবল সরল কৃষকের উদার ব্যবহার আর পল্লীবধূর হৃদয় ভরা ভক্তি, প্রেম, সরলতা!

এই 'মুরিবেন্সুই' সামন্তরাজ বাহরামের শাসনাধীন।

বাহরাম ক্রূর কৌশলী, রাজনীতিজ্ঞ দাম্ভিক পুরুষ ছিলেন। সামান্য ভূম্যাধিকারী হইতে সম্রাটের মন আকর্ষণ করিয়া চতুর বাহরাম 'মুরিবেনু' প্রভৃতি কয়েকটী জায়গা স্বীয় শাসনাধীনে আনিয়াছিলেন কিন্তু তাহার আকাঙ্ক্ষা শুধু মুরিবেনুতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। রাজধানীতে তাহার প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। কোন প্রজার কাতর নিবেদন, অত্যাচার অবিচারের কোন কাহিনীই তাহার বিরুদ্ধে সম্রাটের দরবারে সাক্ষ্য প্রদান করে নাই। বহুমূল্য মতি জহরৎ তিনি প্রায়ই বাদসাহকে নজরানা দিতেন সুতরাং সন্দেহের কোন কারণ ছিল না। কিন্তু বাহরামের আকাঙ্ক্ষা-তটিনী অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় সাহজাদা খসরু রাজ্যগ্রাসী হইয়া নীরবে প্রবাহিত হইতেছিল। সে ষড়যন্ত্রের কণামাত্র কেহ জানিতে পারে নাই। উচ্চমনা পারস্য সম্রাট বিশ্বাসের বক্ষ পাতিয়া দিয়াছিলেন আর ঘৃণিত সর্পচরিত্র বাহরাম তাহাতে দংশন করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল।

তাহার পর বহুদিন অতীত হইয়া গিয়াছে। বাহরাম কোন প্রকাশ্য শত্রুতা বাদসাহের বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত করে নাই। সুযোগ অভাবই বোধ হয় তাহার অন্যতম কারণ। সীপার কথা প্রসঙ্গে সম্রাটকে একদিন চর নিযুক্ত করিয়া

সামন্তরাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা গুপ্তভাবে জানিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। বাদসাহ তাহা উপেক্ষায় উড়াইয়া দিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার উন্নতির মূলে স্বজাতীয় কেহ কুঠারাঘাত করিবে না। পারস্যের শত্রু-রূপে তাঁহার কোন প্রজা দণ্ডায়মান হইয়া আরব, তুরস্কের কাছে দেশের হীনতার কথা প্রচার করিয়া দিবে না কিন্তু যাহা ভাবা যায় সব সময় তাহা হয় না। নিয়তি তাহার অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়। এক করিতে আর হইয়া যায়। সম্রাটের সাধু উদ্দেশ্য থাকিলেও কালের কশাঘাত তাহাকে সহ্য করিতেই হইবে। ভবিতব্য তাহার চিন্তার সূত্র অন্যপথে চালিত করিল। তাঁহার দূরদর্শী চক্ষু এবার প্রতারিত হইল। বাহরাম সত্যই সম্রাটের অবাধ্য হইল।

ন্যায়নিষ্ঠ সম্রাট এ ব্যবহারে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ন হইলেন মাত্র। তাঁহার অমিত প্রভাব ও বিশ্ববিজয়ী বাহিনী যে সামান্য ফুৎকারেই এ বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিবে সে বিষয়ে তাঁহার কণামাত্র সংশয় ছিল না। একটা করদ ভূপতিকে শাসন করিতে তিনিও তত আয়োজনের আবশ্যক দেখেন নাই। তাই বিশেষ উদ্যোগ না করিয়াই সমরযাত্রা করিয়াছিলেন। সম্রাটের অনুপস্থিতে শীপার

রাজ্যপালনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ যুদ্ধে আলী হোসেন সৈন্য পরিচালনের ভারগ্রহণ করেন নাই। দক্ষিণে আলী রোস্তমকে দমন করিবার নেতৃত্ব তাহাকে দিয়া, পাঁচ হাজারী মন্‌সব্‌দার সাদত আলীকে সঙ্গে লইয়া সম্রাট স্বয়ং এ যুদ্ধে যোগদান করিলেন।

* * * * *

দামামার শোনিত উষ্ণকারী বজ্র গম্ভীর শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। সানাই, নাকারা, শিরায় শিরায় বীরত্বের অনল জ্বালাইয়া দিল। পূর্ব্বপুরুষের বীর গাথা গাহিতে গাহিতে পারস্যের বিজয় কেতন উড়াইয়া, শত শত অশ্বারোহী শত্রুর রুধির লোলুপ উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে রণমদে মত্ত হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। বাদসাহ খস্‌রু তারকা বেষ্টিত শশধরের ন্যায় সুসজ্জিত অশ্বে আরোহণ করিয়া, বাম করে বল্গা ধরিয়া ধীর মন্থরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ সুদৃঢ় বর্ম্মে আচ্ছাদিত, মস্তকে দীপ্ত সূর্য্যপ্রতিম শিরস্ত্রাণ। সুবেশী ছত্রধারী তাহার উপর সুবৃহৎ মুক্তার ঝালর বিশিষ্ট সুবর্ণমণ্ডিত রাজছত্র ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। পথিপার্শ্বে আমির ওমরাহের উন্মুক্ত বাতায়ন পথ হইতে সম্রাটের মস্তকে রাশি রাশি পুষ্পবর্ষিত হইতে লাগিল। “পারস্য সম্রাটের জয় হৌক”

বলিয়া লক্ষকণ্ঠ হইতে নগরবাসীর জয়ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। সহরতলীর মধ্য দিয়া সৈন্যশ্রেণী রণোন্মাদনায় মত্ত হইয়া ছুটিয়া গেল। খোদার দ্বারে রাজভক্ত প্রজাবৃন্দও বাদসাহের মঙ্গল কামনায় খোতবা পাঠ করিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

"কি হ'বে দেলেরা ?"

"তাই তো এ বিপদের দিনে পারস্যের সঙ্গে সখ্য করা একেবারেই উচিত নয়।"

"খুব মীমাংসা ক'রেছিস্, বাঁদীর কাছে পরামর্শ চাইলে এর বেশী আর কি প্রত্যাশা করা যায় ?"

"তবে কি করবে ?"

"তাই ভাব্ছি কি কর্ব।"

"ওসব ভেবে কাজ নাই, পারস্য সম্রাট যুদ্ধে গেছেন বেঁচে থাক্‌লে একদিন না একদিন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'বে।"

সাহজাদী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন, কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। দেলেরা বুঝিল কথাগুলি সময়োচিত হয় নাই। তাই তাড়াতাড়ি সাহজাদীর কাছে গিয়া বসিল। তাঁহার কেশ বিন্যাস করিতে করিতে একটী দীর্ঘ আখ্যায়িকার অবতারণা করিতেছিল; তাহাতে ছিল রাজ্য জুড়িয়া নিমন্ত্রণ, সহর জুড়িয়া পুষ্প তোরন আর গান তামাসার একটা সুদীর্ঘ তালিকা। ইহাতে

ক্রুদ্ধা হইয়া সুলতানা শিরী তাহার প্রতি রোষকষায়িত নেত্রে চাহিলেন। দেলেরা আর কথা কহিতে সাহস পাইল না।

দেলেরা দেখিল সাহজাদীর চক্ষু কোণে মুক্তার ন্যায় জল বিন্দু ছল ছল করিতেছে। কাতর নয়ন যেন বিবশ হইয়া গিয়াছে। সাহজাদী যেন কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেলেন। দেলেরা রুমালে চক্ষু মুছিয়া তাঁহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। শিরী তাহার হাতটা লইয়া খেলা করিতে করিতে ধীরে ধীরে কহিলেন "একটা কথা বল্‌ব দেলেরা, তুই অসন্তুষ্ট হবি না?"

দেলেরা আগ্রহের সহিত বলিল "কি সখি?"

"যদি অমত করিস, আমার মাথা খাস্। সত্য বল দেখি দেলেরা আমি কি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারি? একজন নিরপরাধ, ন্যায়পরায়ণ ভূপতি জীবন পণ ক'রে যুদ্ধে গেছেন—চারিদিকে শত্রু, আর বীরাঙ্গনা আমি, শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে, এ সময় কি আমার বাহিনী নিয়া তাঁকে সাহায্য করা উচিত নয়?"

অবনত মুখে দেলেরা উত্তর করিল "সে যেন আমি বুঝ্‌লাম। কিন্তু দুনিয়ার মুখে চাপা দিতে পার্‌বে না। পাঁচটা অপ্রীতিকর কথা শুন্‌তে হ'বে।"

সদর্পে রাজ্ঞী উত্তর করিলেন "এমন পৃথিবী রসাতলে যা'ক। না দেলেরা, দুনিয়ার যে যা বলে বলুক। বাবা বলে গেছেন 'কন্যা, যেটা ন্যায় পথ জান্‌বে, শত প্রতিবন্ধক পায়ে ঠেলে সে দিকে অগ্রসর হ'বে।' আমি এটা ন্যায় জেনেছি। উদারচেতা পারস্য সম্রাটকে সাহায্য করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য"। সুলতানার স্বর ক্রমে উচ্চতর হইয়া উঠিল। তিনি পুনঃ বলিতে লাগিলেন "হাবিলদারদের সৈন্য সজ্জা করিতে আদেশ দাও। এ যুদ্ধে শুধু কোহস্থানের বাহিনীই অগ্রসর হ'বে না, তার সঙ্গে সুলতানা শিরি এবং অন্তঃপুরচারিনী মহিলারাও সুসজ্জিত অশ্বে বীরবালার ন্যায় অগ্রসর হ'বে।"

যথা সময় দেলেরা সে আদেশ দুর্গমধ্যে প্রচার করিয়া দিল। চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। মহিলারাও আজ সুকুমার দেহে লৌহের বর্ম্ম পরিধান করিয়া, হস্তে তরবারী লইয়া রণসাজে সজ্জিতা হইয়াছে, তাহাদের চাহনীতে আজ সে মাধুর্য্য নাই—আছে শত্রুধ্বংশের জ্বালাময় স্ফুলিঙ্গ, কণ্ঠস্বরে সে কোমলতা নাই আছে বীরত্বের মন্দ্র ঝঙ্কার! আজ তাহারা নূতন—সম্পূর্ণ নূতন! এ দৃশ্য যে দেখিবে, সেই পুলক কণ্ঠে বলিবে "মা! তোরা এমন ভাবে দাঁড়ালে সন্তানের আর কোন ভয় থাকে না!"

সমস্ত প্রাঙ্গণ তুরী নিনাদে, দামামার রক্ত উষ্ণকারী বাদ্যে মুখরিত হইতেছিল, অকস্মাৎ সুলতানা শিরীর আগমনে সব থামিয়া গেল, মুহূর্ত্তের জন্য একটা মৌনতার নীরব অভিনয় হইয়া গেল। কেবল শুনা গেল, সৈনিকের অসির ঝনৎকার, আর কোটী কণ্ঠে ধ্বনীত হইল "সুলতানা, শিরীর জয়"

কোষের তরবারী হাতে লইয়া সুলতানা শিরী সমর তুরঙ্গে আরোহণ করিলেন। বীরাঙ্গনাগণের সম্মুখে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "জাগ ভগ্নিগণ! জাগ সহচরিগণ! বীর দুহিতা, বীর প্রসবিনী বীর শয্যা-সহচরী তোমরা জাগ! কূট ষড়যন্ত্রচক্রে নিষ্পেষিত পারস্য সম্রাটের উদ্ধার হেতু তোমাদের বিশ্ববিজয়িনী শক্তি নিয়ে অগ্রসর হও। যার বক্ষের উপর ব্যোমস্পর্শী ককেসাস্ গর্ব্বোন্নত শিরে দণ্ডায়মান, যে গৌরবিনীর পূত পদতল চুম্বন ক'রে গর্ব্বস্ফীত বক্ষে মহাকায় ক্যাস্পিয়ান মহান অতিথির সম্বর্দ্ধনা করতে চলেছে, সেই চির গরীয়সী কোহস্থানের পুণ্য অঙ্কে লালিত হ'য়ে—তার বক্ষঃ নিঃসৃত পীযূষধারায় পরিপুষ্ট হ'য়ে, আজ যদি তোমরা নীরবে অবস্থান কর, তবে আর কারা বল বীরত্বের চিরলীলাভূমি —সন্তান গর্ব্বে গরবিনী এই অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী মহীয়সী

জননী জন্মভূমির গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বে ? জাগ ভগ্নিগণ ! তোমাদের কুসুম কোমল করধৃত নির্ম্মম কঠোর কৃপাণের তীব্রদীপ্তি শত্রুর চক্ষে অগ্নিজ্বালা সৃষ্টি করুক, তারা সসম্ভ্রমে তোমাদের সম্মুখে তাদের গর্ব্বোন্নত শির নত করুক। জগৎ দেখুক লক্ষ বিবর্ত্তনের মধ্যেও কোহস্থান সেই পূর্ব্বের কোহস্থানই আছে। দূরে ওই ফেনিল তরঙ্গময় বিশালকায় নীলাম্বুধি তোমাদের এই মহা জাগরণ সংবাদ প্রদানের নিমিত্ত অস্থির উদ্দাম বেগে দিক্ অন্তে ছুটে চলেছে। বিধাতার পুণ্য আশীর্ব্বাদ প্রভাত সৌরকররূপে তোমাদের ললাট দেশ চুম্বন করছে। তবে এস ভগ্নিগণ ! খোদার পবিত্র নাম উচ্চারণ করে, বিপন্নের উদ্ধার কল্পে, শত্রুর সম্মুখীন হই ; গরিমাময়ী জননী কোহস্থানের সন্তান ব'লে বিশ্বের কাছে পরিচিত হই।"

ঝঙ্কার থামিল কিন্তু প্রত্যেকের মর্ম্মবীণার তারগুলি নূতন রাগিনীতে বাজিয়া উঠিল। একটা মহা উন্মাদনা সকলকে নাচাইয়া তুলিল, তাহারা তুচ্ছপ্রাণ সাহজাদীর আহ্বানে বিসর্জ্জন দিতে কৃত সংকল্প হইল !

দেলেরা অগ্রসর হইয়া বলিল "বহিন ! যদি মরিস্ তবে ফুলের গোড় গোলাবে সিক্ত করে শুইয়ে রাখ্‌ব—

চিরজীবন তোর সমাধির পাশে মাথা নত ক'রে যাব, আর সমর জয়ের পর যারা অবশিষ্ট থাক্‌বি, তাদের গলায় অম্লান কুসুমের হার পড়িয়ে বাঁদী আনন্দাশ্রুতে চরণ ধৌত ক'রে দেবে।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

'মুরীবেমুর' বিস্তৃত প্রান্তরে আজ দুইজন ভাগ্য পরীক্ষা হেতু পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছেন। জয়শ্রী কাহার অঙ্কশায়িনী হইবে কে বলিতে পারে? অনুকূল বায়ুভরে কাহার যে ভাগ্যপোত পারাবারের তটভূমে নির্ব্বিঘ্নে উপনীত হইবে; কাহার সৌভাগ্য তারকা যে মেঘবক্ষে লুকাইয়া আছে কে বলিতে পারে? এ কালযুদ্ধের অবসানে কে জানে যে পারস্যের বংশে কলঙ্কের মসীরেখা পড়িবে না? কে বলিতে পারে যে চিরবিজয়ী আর্ত্ত-জারিসের বংশ একটা সামান্য করদ রাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ফিরিয়া না যাইবে?

—যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ঘোর বিক্রমে বাদসাহের সৈন্যপুঞ্জ বাহরামের ব্যূহ ভঙ্গ করিতে অগ্রসর হইতেছে কিন্তু এমনই কৌশলে সেই মণ্ডলাকার সৈন্য শ্রেণী গঠিত ছিল যে পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড আক্রমণেও তাহারা কক্ষ ভ্রষ্ট হয় নাই। সে যুদ্ধে উভয়ে শত্রুভাবে দণ্ডায়মান

হইলেও, ক্রূর কৌশলী সামন্তরাজ স্বাধীনতার চিহ্ন স্বরূপ রাজচ্ছত্র গ্রহণ করেন নাই। দূরে উচ্চ তুরঙ্গ হইতে মস্তক অবনত করিয়া সম্রাটকে অভিবাদন জানাইয়াছিলেন। বাদসাহ এ সৌজন্যের কারণ কিছু বুঝিতে পারেন নাই।

অস্ত্রের ঝনাৎকার, তুরঙ্গের হ্রেষা রব, রণবাদ্যের গম্ভীরনাদ ও সৈন্যের কোলাহল ক্ষুদ্র 'মুরাবেনুকে' শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। ক্রমে অন্ধকারে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছাদিত হইল, যোদ্ধার উত্তোলিত অসি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গেল।

সহসা শত দেউটীর উজ্জ্বল আলোকে রণভূমি আলোকিত হইয়া গেল। যোদ্ধা আবার অরাতির শির লক্ষ্য করিয়া সুতীক্ষ্ণ বর্শা নিক্ষেপ করিল। আহতের আর্ত্তনাদ, জীবন্তের সমাধি, আর জয়োন্মত্ত সৈন্যের উচ্চ জয়োল্লাস সেই ভীষণ রণস্থলকে আরও ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিতেছিল। সম্রাট যখন শত চেষ্টা করিয়াও বাহরামের সৈন্য শ্রেণী মথিত করিতে পারিলেন না, তখন তিনি একবার হতাশ্বাস বাহিনীর অবসন্ন মুখপানে চাহিলেন, চকিতে একবার নিরাশার মর্ম্মন্তুদ জ্বালাময়ী বিদ্যুদ্দাম তাঁহার হৃদয়ে উঁকি মারিয়া চলিয়া গেল; কিন্তু সহসা তিনি ভগ্নোদ্যম হইলেন না। একবার শেষ চেষ্টা করিতে সে

শত্রু-সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিলেন। সৈন্যগণও একবার নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়া ভীম বিক্রমে আক্রমণ করিল। এ আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া বাহরামের সুশৃঙ্খল সৈন্য শ্রেণী ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল কিন্তু ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ সম্রাট বহুক্ষণ আর সেই অসুর পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে পারিলেন না; শীঘ্রই তাহাকে যুদ্ধ ত্যাগ করিতে হইল, এক অলক্ষ্য শর আসিয়া তাঁহার একমাত্র সহায় প্রভুভক্ত অশ্বটীকে ভূমি শয্যা গ্রহণ করাইল।

পারস্যের ভাগ্যাকাশের জ্যোতিষ্মান নক্ষত্র আজ কক্ষ ভ্রষ্ট হইয়াছে। পারস্য সম্রাটের এই শোচনীয় পরিণাম কেহ কখন কল্পনাও করিতে পারে নাই। বীরাগ্রগণ্য বিশ্বাসী সাদত আলী আত্মপ্রাণ দিয়া সম্রাটের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। যোদ্ধৃগণ অস্ত্র ও পরিচালকহীন হইয়াও জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পিতৃপুরুষের সম্ভ্রম নষ্ট করে নাই, রণেপৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া জগতের ইতিহাসে দুরপনেয় কলঙ্করেখা রাখিয়া যায় নাই।

যখন জয়োন্মত্ত বাহরাম, পারস্য অভিমুখে সৈন্যচালনা করিতে সঙ্কেত করিতেছিল, যখন রণোন্মত্ত সৈন্যগণ রুধির পিপাসী তরবারিকে আহতের রক্তপান করাইতেছিল, যখন শত আর্ত্তনাদ উপেক্ষা করিয়াও আরোহী

লইয়া মুমূর্ষ সৈনিকের বক্ষের উপর দিয়া অশ্ব দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছিল, তখন এক অনৈসর্গিক অভাবনীয় ঘটনায় অদৃষ্টের সূত্র কেমন জড়াইয়া গেল; নির্ম্মেঘ আকাশতলে সহসা যেন এক খণ্ড ধূমরেখা উদিত হইল; বিজয়ী বাহরাম ক্ষণতরে উদ্দেশ্য ভুলিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। এক প্রচণ্ড দুর্ম্মদ বাহিনী আসিয়া বাহরামের জয়োন্মত্ত সৈন্যশ্রেণীর উপর ঝম্প দিয়া পড়িল।

ইহার পর আগত যোদ্ধৃগণের আক্রমণের উদ্দেশ্য কি এবং তাহারা কোন স্বাধীন শক্তি, একথা বাহরামের পক্ষ হইতে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল। পরিচয়ে তাহারা ভীমনাদে উত্তর করিয়াছিল "কোহস্থানের অপরাজেয় শক্তি—বাহরামের ধ্বংস।"

সামন্তরাজ প্রমাদ গণিলেন। আশার পূর্ণতার মুখে বিভীষিকা দেখিয়া তিনি বড় মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন; ভাবিলেন, যদি ইহাদের সহিত আমায় যুদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে পারস্য বিজয়ের কল্পনাও এইখানেই সমাধিস্থ করিতে হইবে, বিলম্বে পারস্য জয়ের আশা নাই, কারণ আলী হোসেন রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলে পারস্য জয় সুকঠিন হইবে। সুতরাং ইহাদিগকে অর্থের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া গন্তব্য পথে চলিয়া যাইব'। তাহার চাতুর্য্য

সফল হয় নাই, আগত যোদ্ধৃগণ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে নাই। সামন্তরাজের এই কাপুরুষোচিত কথা শুনিয়া তাহারা অবজ্ঞা ভরে হাসিয়া উঠিল। আর ক্ষণকাল অপেক্ষা না করিয়া সেই আগন্তুক দুর্ম্মদ বাহিনী বাহরামের সৈন্যশ্রেণী আক্রমণ করিল। উৎকণ্ঠিত ভগ্ন হৃদয় করদ ভূপতি বড় সমস্যায় পড়িলেন। তাঁহার চক্ষু পারস্য মস্‌নদের জয় চিন্তায় ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহার অবসন্ন সৈন্যেরা আর সেরূপ উৎসাহে যুদ্ধ করিতে পারিতেছিল না। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বাহরামের সুসজ্জিত বাহিনী ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। এই শক্তিশালী বীরগণের সম্মুখে তাহার সৈন্য সমূহ অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিল না। অধিকন্তু তিনিও উৎসাহ-হীন, কয়েক স্থানে আহত। বাহরাম দেখিল পারস্য বিজয় সুদূর পরাহত। দীর্ঘদিনের আয়োজন, চিরকালের আশা, চিরজীবনের লক্ষ্য—সাধ আকাঙ্ক্ষা, যাহা তিনি এতদিন পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন তাহা বুঝি আজ মূহুর্ত্তের প্লাবনে ভাসাইয়া দেয়! শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, তরণী কুলে আসিয়া বুঝি বা ডুবিয়া যায়। হইলও তাহাই, সে বিপুল আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া, পারস্য জয়ের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, বাহরাম সসৈন্যে

রণে ভঙ্গ দিলেন। কয়েকজন প্রমত্তবীর তাহার অনুধাবন করিতে যাইতেছিল কিন্তু পশ্চাৎ হইতে কে যেন স্ত্রী কণ্ঠে বলিল, "সৈনিকগণ! পলায়িত ভয়ার্ত্তের অনুসরণ ত্যাগ কর। কোহস্থানের সুলতানা এ জঘন্য প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিতে একান্ত অনিচ্ছুক।" অশ্ববল্গা শমিত করিয়া ভূমি সংলগ্ন দৃষ্টি যোদ্ধৃগণ কোষমুক্ত অসি ললাটে স্পর্শ করতঃ সাহজাদীর আদেশ মানিয়া লইল।

অতঃপর অর্দ্ধ চন্দ্র-সুশোভিত-মুকুট-ধারিনী কর্ম্মপ্রাণা, স্নেহার্দ্র হৃদয়া রমণী কুলরাণী শিরী সেই রক্ত প্লাবিত রণস্থলে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া আহতের সেবাব্রতে, মুমূর্ষের মুখে বারিধারা দান করিতে, পরিচারিকাগণকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সে এক অভাবনীয় দৃশ্য! কল্পনার অচিন্তনীয় গভীরতা! সুকোমল মখমলের উপর পদক্ষেপ করিতে যিনি বেদনা অনুভব করিয়াছেন, সুবর্ণ সিংহাসনে বসিয়াও যিনি পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই; আর সহস্র বাঁদী যাঁহার খেদমত খাটিয়াও মনের অশান্তি দূর করিতে পারে নাই—আজ সেই সুখলালিতা বেগম সাহেবা মৃত আত্মার প্রতি সৌজন্য দেখাইতে, নগ্নপদে আর্ত্তের কাতর আহ্বান লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া যাইতেছেন। কোথাও ছিন্ন হস্তপদ যুবকের মস্তকটী নিজ উরুদেশে

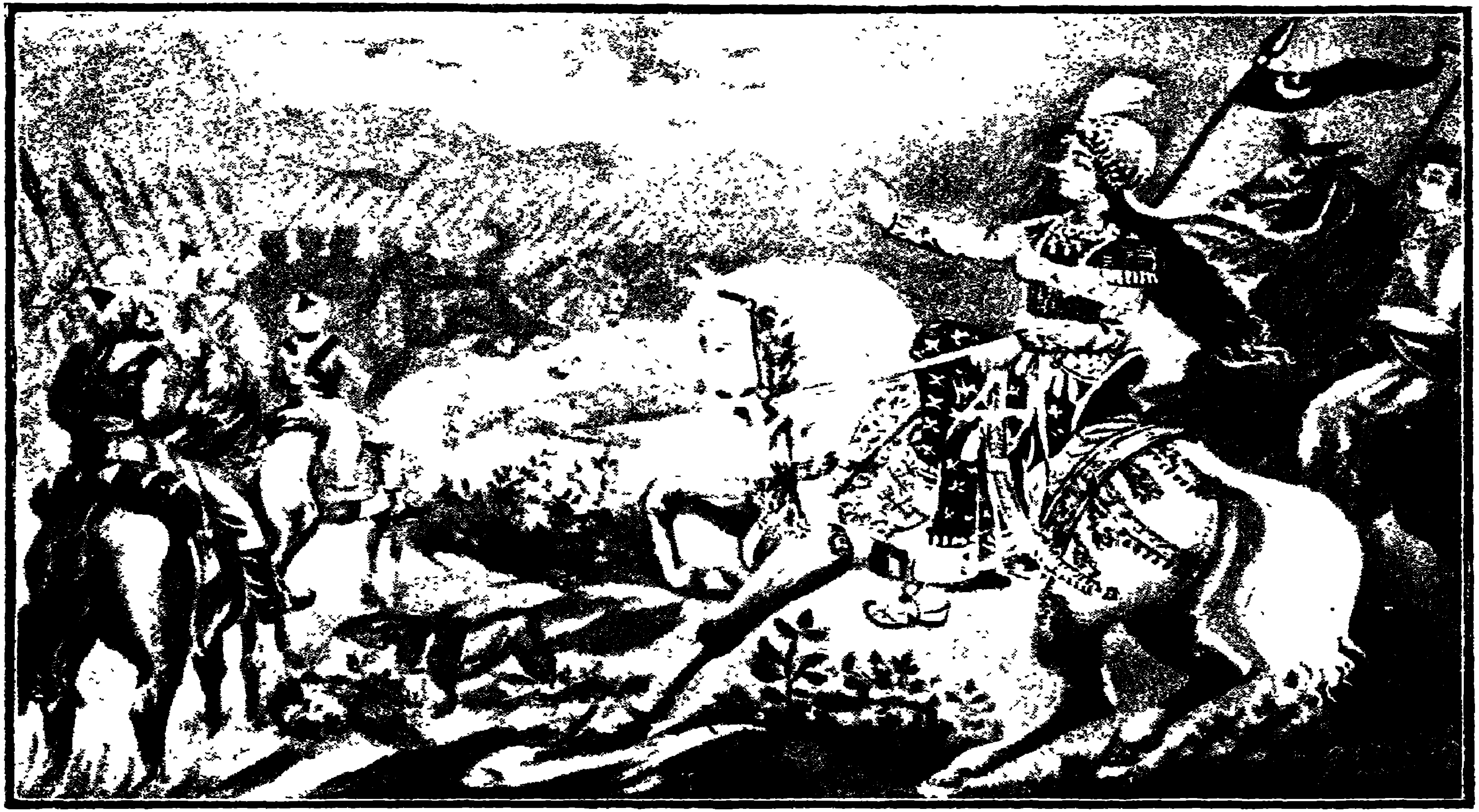

"সৈনিকগণ! পরাজিত—ডুয়ার্টের অনুসরণ ত্যাগ কর" (৯৮ পৃষ্ঠা)

স্থাপন করিয়া, মাতার ন্যায় করুণ আশ্বাসে তাহার ক্ষত মুখে স্বীয় বসন প্রান্ত বাঁধিয়া দিতেছেন, আর কোথাও যন্ত্রনা কাতর সৈনিকের মুখটী মুছাইতে মুছাইতে সরলা রাজ্ঞী বালিকার ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিতেছেন। স্বয়ং ফাতেমা দেবী বোধ হয় এ লোক নিগ্রহ সহ্য করিতে না পারিয়া বিশ্বজননী মূর্ত্তিতে বেহেস্ত হইতে আজ এই রণভূমে দেখা দিতে আসিয়াছেন !

চারিদিকে হতাহতের রাশি, চারিদিকে দুঃখ আর্ত্ত-নাদের স্বর, চারিদিকে জীবন মরণের ছায়া, সেই রণভূমির বক্ষের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছিল—বাজিয়া উঠিয়াছিল—ঘনাইয়া আসিয়াছিল। একটুকু যেখানে করুণা নাই, একটুকু যেখানে সহানুভূতি নাই, একটুকু যেখানে ক্ষমা নাই—যেখানে মানুষ স্বার্থের সিংহাসনে বসিয়া মরণের রোদনেও বধির থাকে, আজ সেখানে স্বর্গ হইতে খোদার করুণা যেন মূর্ত্তিমতী রূপে অবতীর্ণা হইয়াছে !

সেই প্রান্তরের নিভৃত দেশে দয়াবতী শিরী-মমতাময়ী শিরী একটা দীর্ঘ শিবির স্থাপন করিয়াছেন। আহত যোদ্ধৃগণের সেবার জন্যই এই বিস্তৃত তাবু ফেলিয়াছেন। কক্ষে কক্ষে সেবার উপকরণ, কক্ষে কক্ষে শুশ্রূষাকারিণীর পরিচর্য্যা, সেই মরণ সঙ্কুল রণস্থলটি সান্ত্বনার রাজ্যে

পরিণত করিয়াছিল। তাঁহাদের চক্ষে মমতা, কণ্ঠে অভয়-বাণী, পরিচ্ছদে কি অপূর্ব্ব শোভা ফুটিয়া উঠিয়াছে! যেন স্বর্গের সুরবালা মর্ত্তের দুঃখরাশি দূর করিতে নামিয়া আসিয়াছে! ধন্য কোঙস্থান রাণি! ধন্য তোমার সেবাব্রত! আজ যে আদর্শ তুমি বিশ্ব নারীর সম্মুখে ধরিলে তাহা মহান—উচ্চ—পবিত্র। সেবায় যদি পুণ্য থাকে তবে দেবি! লোক চক্ষু অন্তরালবর্ত্তী পীযূষ-সলিলা স্রোতস্বিনী পরিসেবিত পুণ্যময় প্রদেশ হ'তে খোদার আশীষ তোমার মস্তকে স্বতঃই ঝড়িয়া পড়িবে!

সেই পতিত সৈন্যশ্রেণী মধ্যে মায়ের ভূমিকায় যিনি অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, অসংখ্য কণ্ঠ পবিত্র "মা" "মা" শব্দে যাঁহাকে শত সহস্র সন্তানের জননীরূপে ঘোষণা করিতেছিল, তাঁহার করুণ আঁখির দৃষ্টি যেন কাহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় প্রতি আহতের মুখের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। উজ্জ্বল দীপ শিখায় রণক্ষেত্র শায়িতের মুখ-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাঁহার হৃদয় দুরুদুরু কাঁপিয়া উঠিতেছিল। চক্ষু যেন সাবধান হইয়া সে দৃশ্য দেখিবার পূর্ব্বেই মুদিয়া আসিতেছিল। সহচরীরা "আহা! হতভাগ্যের পৃষ্ঠদেশে বর্শার গভীর আঘাত" "না না ইহার এখনও প্রাণ আছে।" ইত্যাদি বলিয়া আহত-

দিগকে শিবিরে লইয়া যাইতেছিল। সুলতানার বক্ষস্থল কাঁপিতেছিল, ক্ষণে ক্ষণে দেহে রোমাঞ্চ দেখা দিতেছিল, চক্ষের সম্মুখে যেন একটা ভাবী অশুভের ছায়া ক্রমে ক্রমে ঘনাইয়া আসিতেছিল। দুই পার্শ্বে সৈন্যশ্রেণী দেখিতে দেখিতে সাহজাদী সেই সেই বিশাল যুদ্ধক্ষেত্রের সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গগনে কৃষ্ণাদ্বাদশীর চন্দ্র এই মাত্র উঠিতেছে। নিশার শেষযামে দুই একটা পক্ষী ডাকিতেছে; দূর হইতে বন্য শেফালির মৃদুগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। সুলতানা যুদ্ধক্ষেত্রের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আসিয়া দেখা দিলেন, সে দীর্ঘপথ ভ্রমণে তাঁহার কষ্ট নাই; শত স্থানে পড়িতে পড়িতে রক্ষা পাইয়া, শত বেদনায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি এতটা পথ চলিয়া আসিলেন কিন্তু চরণ আর চলিতে চাহে না। আশার আলো নির্ব্বাপিত হইয়াছে, মনের শক্তি অপহৃত—নষ্ট—বিধ্বস্ত। চক্ষের সে শুষ্ক চাহনি দেখিয়া সহচরী দেলেরা শিহরিল, ভাবিল 'এইবার না জানি কি এক বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় হয়। সকলেই সন্ত্রস্ত নির্ব্বাক। দেলেরা আর একটু অগ্রসর হইল, সাহজাদীও ঔদাস্য ভরে পদক্ষেপ করিতে লাগিলেন। "আছে" "নাই" এই সন্দেহ হৃদয়ের সূক্ষ্ম সূত্রগুলি কাটিয়া দিতেছে।

তবে আর কেন? যখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে, কোন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে যখন সাধের তরণীখানি নিমজ্জিত হইয়াছে,তখন আর আশা কেন? না না ওরে মন! তোর পায়ে ধরি, তোর কি এ রহস্য করিবার সময়? মরণ নিয়া খেলা করিস্ না, কেন আর আশা দিস্, যখন ফুরিয়ে গেছে তখন আর কেন চোখের জলে বাধা দিস্। মন বুঝিল না আশা ক্ষীণ স্রোতে হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। আলোটা একটু উচু করিয়া দেলেরা দেখিল আর এক আহত সৈনিক ক্ষীণকণ্ঠে জল ভিক্ষা করিতেছে। সকলেই ছুটিল, শিরী পায়ের পর পা গণিয়া গণিয়া চলিতে লাগিলেন। সহচরী ছুটিয়া গিয়া চিনিয়াছিল; বিশেষতঃ সম্রাটের রাজদণ্ড পার্শ্বে পতিত থাকায় সন্দেহ করিবার কোন কারণই ছিল না। সকলেই নতজানু হইয়া মুমূর্ষ পারস্য সম্রাটকে অভিবাদন করিল। দেলেরা আবেগে বলিয়া ফেলিয়াছিল "সুলতানা —ছুটে এস, যাঁর দর্শনের জন্য কোহস্থানের রাজনন্দিনী হ'য়ে, আজ এই সমরক্ষেত্রে দেখা দিয়েছ; লজ্জা সরম আত্মসম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে পদব্রজে এতটা পথ চলে এসেছ—এই দেখ তাঁর শোচনীয় অবস্থা! মৃত্যুর দ্বারে উপনীত তৃষ্ণার্ত্ত সম্রাটের চক্ষু দুটী এই কথা শুনিয়া

উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। যন্ত্রণা কাতর মুখমণ্ডলে ঔৎসুক্যের চাঞ্চল্য দেখা দিল নিমীলিত প্রায় আঁখির দৃষ্টি উপস্থিত রমণীগণের মুখের উপর দিয়া এক এক করিয়া চলিয়া আসিল। অস্থি পঞ্জর ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস হৃদয়ের গভীরতা প্রকাশ করিয়া দিল।

সাহজাদী দেলেরার স্বর শুনিতে পাইলেন, জাগরণের মধ্যে সুপ্তি নিমজ্জিত হইল। একটা প্রবল উচ্ছাসে সে পুষ্পময়ী নবনীত কোমলা রমণীর হৃদয় সাগর আলোড়িত হইয়া উঠিল। যাঁহার আলেখ্য দেখিয়া মজিয়াছি, নিজকে বিলাইয়া দিয়াছি—যাঁহার স্বপ্নে, যাহার ধ্যানে নিজের স্মৃতি হারাইয়া ফেলিয়াছি, যে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার ছলনাময়ী মরিচিকার পাছে পাছে ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় ছুটিয়া মরিয়াছি—সে যে আজ দেখা দিয়াছে, আপনাকে লুকাইতে গিয়া চতুর বিহঙ্গ লতাবন্ধনে জড়াইয়া পড়িয়াছে। তবে আমি কেন ছুটিয়া যাইব না? পাখীর স্বর বুকে লইয়া মরিতাম কিন্তু আর মরিতে ইচ্ছা নাই।

সুলতানা প্রথমে ধীরে ধীরে আহত সম্রাটের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আর কি স্থির থাকা যায়! সুলতানা আপনার কথা ভুলিযা গিয়া, সাম্রাজ্যের কথা ভুলিয়া গিযা, দণ্ডায়মানা সহচরীদের কথা ভুলিয়া গিয়া সেই

রুধিরাপ্লুত বক্ষের উপর ঝুকিয়া পড়িতেছিলেন, পশ্চাৎ হইতে দেলেরা আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, বলিল "সাহজাদী স্থির হও।"

আর একবার চমকিয়া আহত পুরুষ আশা উৎফুল্ল চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলন করিলেন। সহসা তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গে সজীবতা দেখা দিল। বিবশ হস্তপদ চঞ্চল হইল, আবেগ কম্পিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন "তুমি! তুমি! আমার হৃদয় মরুভূমির।"—বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল কপালে স্বেদবিন্দু দেখা দিল। অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনায় তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। আর সাহজাদীকেও অনেক ডাকিয়া কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তিনি আহতের মূর্চ্ছার সঙ্গে সঙ্গে দেলেরার অঙ্কে ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ।

"আমি কোথায় ?"

হাতের রুমালখানি মেজের উপর রক্ষা করিয়া, এক রূপসী মহিলা পীড়িতের হাত ধরিয়া তাহাকে আবার শয্যায় শোয়াইয়া দিল ; বলিল "আপনি উঠ্‌তে চেষ্টা কর্‌বেন না, এখনও ক্ষতস্থান হ'তে সময় সময় রক্ত পড়ে ।"

ঔদাস্যময় দৃষ্টিতে শয্যাশায়ী জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি কতকগুলি কথা জান্‌তে পারি কি ? আপনি কি যথাযথ উত্তর দিবেন ?"

উত্তরে রমণী নম্রভাবে কহিল "আপনি আমাকে 'আপনি' ব'লে সম্বোধন কর্‌বেন না—আমি বাঁদীমাত্র । যা জানি তার একটীও গোপন কর্‌ব না ।"

বড় কাতরে উপবিষ্টা নারীর দিকে চাহিয়া আহত পুরুষ ধীরে ধীরে বলিলেন "তুমি বাঁদী, তোমার ত বেশ কথাবার্ত্তা ? আচ্ছা, যদি কখনও সুদিন ফিরিয়ে পাই, তোমার 'এনাম' বাদ যাবে না ।"

বাঁদী কুর্নিশ করিয়া এ কথার সম্মান রক্ষা করিল। বক্তা পুনরায় বলিতে লাগিলেন "সত্য বলত, মুরিবেন্নুর যুদ্ধের পরিণাম কি? না—কাকে জিজ্ঞাসা করছি?"

"যদিও আমি সবিশেষ জানি না কিন্তু এ যুদ্ধে সম্রাট পক্ষ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হ'য়েছিলেন।"

হাসিতে হাসিতে ঘাড় নাড়িয়া তাহা আহত অস্বীকার করিলেন, কহিলেন. "না নারি, তুমি পারস্য সম্রাটকে জান না। তাঁর বিশ্ববিজয়ী শক্তি তুষার স্তূপ অতিক্রম ক'রে, জয়ের মুকুট পরিধান ক'রে এসেছে। মুরিবেন্নুর দশ সহস্র সৈন্যকে বাধা দিতে স্বয়ং সম্রাটও অসি ধারণ ক'রেছিল. তবে কেন মিথ্যা পরাজয়ের জনবর তুলছ। একথা কেউ বিশ্বাস করবে না, তোমার কথার কোন মূল্য নাই।"

আনত বদনা দাসী আর কোন উত্তর করিতে পারিল না। কেবল পীড়িতের মুখের দিকে চাহিয়া এই কথা গুলি শুনিয়া গেল। আহত পুরুষ একবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া পুনরায় উঠিতে চেষ্টা পাইলেন। বাঁদী তাহাকে বাধা দিয়া কহিল "জাঁহাপানা! বাঁদীর বে-আদবি মার্জ্জনা করবেন; বেগম সাহেবার আদেশ

আপনি সম্পূর্ণ নিরাময় না হ'লে শয্যা হ'তে উঠ্‌তে পার্‌বেন না।”

পীড়িত একটু রোষের সহিত উত্তর করিলেন “সে আদেশ আমি কেন মান্য কর্ত্তে যাব? তিনি যদি বেগম সাহেবা—আমিও সম্রাট।”

হাজার হাজার তস্‌লিম জানাইয়া বাঁদী ধীরে ধীরে কহিল “সে কথা দাসীর অজ্ঞাত নয়।”

“তবে কি আমি বন্দি? আমি এ কোথায় আছি?”

“দুষ্‌মন বন্দী হ'ক। আপনি নিরাপদ।”

“আমি তা হ'লে কার আশ্রয়ে কোথায় আছি জান্‌তে পারি কি? আমার একটু একটু মনে পড়্‌ছে আমি আহত হ'য়ে রণসজ্জা গ্রহণ করেছিলাম। তার পর—”

‘তার পর কোহস্থানের—”

সম্রাট বাধা দিয়া কহিলেন “আর বল্‌তে হ'বে না।”

সহসা পীড়িতের মুখমণ্ডল ভস্মের ন্যায় সাদা হইয়া গেল। স্তিমিত নেত্র দুটী বিস্ফারিত হইয়া উঠিল; দুর্ব্বল হৃদয়ের স্পন্দন দ্রুত বেগে চলিতে লাগিল। দেহের প্রতি লোমকূপ হইতে তেজোময়ী স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল; তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; আত্মবিস্মৃত হইয়া কপালের প্রলেপময় পটীটা বাম-

হস্তের দৃঢ় আকর্ষণে তুলিয়া ফেলিলেন। অবস্থা ভুলিয়া মানসিক উত্তেজনায় বাদসাহ শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। দেহের ও মনের অত্যধিক চাঞ্চল্যে ললাটের ক্ষতদেশ হইতে আবার রক্তস্রাব আরম্ভ হইল। শঙ্কিতা বাঁদী থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সম্রাট প্রভৃত রুধির স্রাবে অবসন্ন হইয়া শয্যার উপর মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। পরিচারিকা কিংকৰ্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া নীরবে দাড়াইয়া রহিল। সম্মুখে একজন মরিতে বসিয়াছে কিন্তু সে সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতে পারিল না বা হাকিমকে ডাকিতে ছুটিয়া গেল না; ভয়ে স্তম্ভীভূত হইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত নিশব্দে কাটাইয়া দিল তারপর সহসা চমকিত হইয়া গৃহ হইতে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

মুরীবেনুর দীর্ঘ প্রান্তরে পারস্য সম্রাট যখন আহত হইয়া ভূমি শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, নীরবে যখন তাহার এ জীবনের সমাধির আয়োজন হইতেছিল, তখন পিপাসা কাতর বাদসাহ মরণের দ্বারেও একবার আকাঙ্ক্ষিতার দর্শন লালসা করিয়াছিলেন। এমনই হয়, মরিতে যাইতেছি তথাপি একবার শেষ দেখা দেখিব, সে কণ্ঠের স্বর একবার শুনিয়া লইব, মানুষ এমনই পাগল! প্রেমে এমনই উন্মাদনা!

রণস্থল হইতে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ সম্রাট সুলতানা শিরীর তাঁবুতে আনীত হইয়াছেন, অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হয় নাই। বাদসাজাদীর পার্শ্বের প্রকোষ্ঠই তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সমজদার শিক্ষা সহবৎ প্রাপ্ত সুচতুর ভৃত্যগণ সম্রাটের সুখ শান্তি বিধানে ও অনুক্ষণ আজ্ঞাপালনে তৎপর ছিল। সাহজাদী স্বয়ং রোগীর শয্যা পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে ঔষধ সেবন করাইতেন। বহুদর্শী বিচক্ষণ হেকিমগণ পারস্যাধিপের পীড়া নিরাময়ে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পারস্যের রাজপ্রাসাদে থাকিলেও তিনি ইহাপেক্ষা কোন যোগ্য ব্যক্তির হস্তে অর্পিত হইতেন বলিয়া বোধ হয় না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। সাহজাদী আপন কক্ষে বসিয়া হাতের রেশমী রুমালে গোলকুণ্ডার পাঁচটী মূল্যবান মতি বাঁধিয়া রাখিতেছিলেন, এমন সময় বাঁদী হাফাইতে হাফাইতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ব্যস্ততার সহিত বলিয়া উঠিল "সর্ব্বনাশ হয়েছে সাহজাদী!"

পথিপাশে সহসা সর্প দর্শনে সন্ত্রস্তা বালিকার ন্যায় সুলতানা শিরী চমকিত হইয়া উঠিলেন; নিমেষ মধ্যে তাঁহার শত উজ্জ্বল তারকাময় হৃদয় আকাশ যেন অন্ধকার হইয়া গেল, বেতসলতার ন্যায় কম্পিতা বাদসা-

জাদী ভীতিপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হ'য়েছেরে মৈমুন ?"

এক নিশ্বাসে শঙ্কিতা বাঁদী উত্তর করিল "আবার ললাটে রক্তস্রাব আরম্ভ হ'য়েছে, সম্রাট মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছেন।"

বাঁদীর দিকে চাহিয়া একবার মাত্র "হেকিম পীর-মহম্মদ" বলিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় সুলতানা দেহের বস্ত্র যথাস্থানে রক্ষা করিবার পূর্ব্বেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

সম্রাট খসরু অজ্ঞানাবস্থায় শয্যার উপর পড়িয়া রহিয়াছেন। বিস্রস্তবসনা রোরুদ্যমানা রাজনন্দিনী দ্রুতবেগে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। শয্যা পার্শ্বে যাইতে তাঁহার হৃদয় কাঁপিতেছিল। মনে মনে নানারূপ অসঙ্গত কথা উদিত হইতেছিল। চিন্তা কাতরা সুলতানা একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলেন শয্যা রুধিরসিক্ত, আহত অচৈতন্য। তাড়াতাড়ি নিজের রুমাল ভিজাইয়া আহতের মুখে চোখে জল দিতে লাগিলেন। আহতের নিশ্বাসের একটু তারতম্যে, বক্ষের দ্রুততর স্পন্দনে তিনি কি যে করিবেন ঠিক করিতে পারিতেছেন না। সশঙ্কিতা সুলতানা সম্রাটের মস্তকের একটা নূতন পটী যথাস্থানে

বাঁধিয়া দিতেছিলেন, বাদসাহ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "তুমি যাও, আমি তোমার কোন কথা শুন্‌তে চাই না, দেবীর রাজ্যে শয়তানের আবির্ভাব হ'তেই পারে না।"

অশ্রুমুখী সুলতানা করুণস্বরে, বলিলেন "তুমি অমন কর্‌ছ কেন? কি যাতনা হ'চ্ছে বল।"

সম্রাট হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন "দুনিয়ার শেষে সাগরের পার। বেহেস্তে কেবল একটা হুরীর মুখ। আমার প্রাণে শুধু সেই যে--কার তরল চক্ষু—"

সাহজাদী আর এ দৃশ্য দেখিতে পারিলেন না। দুই হস্তে চক্ষু আবৃত করিয়া সম্রাটের পায়ের তলায় হস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন "খোদা তুমি সর্ব্বশক্তিমান, আজ একি কর্‌লে! একি বিচার তোমার দয়াময়!" রাজনন্দিনী সম্রাটের পায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া দুই ফোটা চোখের জল ফেলিয়া বসিলেন।

সহসা পদধ্বনি শুনিয়া সাহজাদী হৃদয়ের আবেগ চাপা দিয়া, আর্দ্র আঁখি মুছিয়া ফেলিলেন। যাহারা আসিল সংখ্যায় তাহারা অল্প নহে। বৃদ্ধ হেকিম পীরমহম্মদ ও

তাহার ভৃত্য। দেলেরা, আমিন বক্স, করিমন, রোশন, মতি, জোহরা প্রভৃতি পরিচারিকা ও তস্য পরিচারিকাগণ।

কিন্তু সকলের মুখ সহানুভূতি পূর্ণ নহে। কেহ একজন যাইতেছে দেখিয়া তাহার পশ্চাৎ লইয়াছে, কেহ বৃদ্ধ হেকিমের দেশ জুড়িয়া সুখ্যাতির প্রমাণ করিতে আসিয়াছে, কেহ রক্তম্রক্ষিত বিবশ মানবের আকৃতির কি বৈলক্ষণ্য ঘটে তাহা দেখিবার ইচ্ছা করিয়া দর্শন দিয়াছে, আর কেহ সাহজাদীর নিশ্বাসের সঙ্গে দু একটা কৃত্রিম নিশ্বাস ফেলিয়া হৃদয়ের পরিচয় দিতে আসিয়াছে। পীর মহম্মদ রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া স্বগতঃ কি একটা আন্দোলন করিতে লাগিলেন। সাহজাদী পর্য্যঙ্কের উপর স্বীয় পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়া চিকিৎসকের অভিমত জানিবার জন্য আগ্রহ পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়াছিলেন। ঔষধ পূর্ণ বাক্স হইতে একটা রৌপ্যতবকে মোড়া ঔষধ হেকিম সাহেব বাহির করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে গৃহখানিও সৌরভে পূর্ণ হইয়া উঠিল। খোদার নাম লইয়া সপ্ততিবর্ষ বয়স্ক শিথিল হস্ত বৃদ্ধ আহতের মুখে সেই গুঁড়া ঔষধটা নিক্ষেপ করিলেন। সুলতানা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি দিলেন হেকিম সাহেব?"

তসলিম জানাইয়া বৃদ্ধ উত্তর করিলেন কিছু না মা,

ভয়ের কোন কারণ নাই, অধিক রক্তস্রাবে দুর্ব্বল হ'য়েছিলেন মাত্র; একটু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত কস্তুরী দিয়েছি, এখনি জ্ঞান লাভ করবেন।"

আশু কার্য্যকরী তীব্র ঔষধের গুণে আহত স্বাভাবিক মানবের ন্যায় চক্ষু উন্মীলন করিলেন; সুলতানার অবিচলিত স্থির দৃষ্টি এ দৃষ্টির সহিত মিলিয়া গেল। স্বভাব লজ্জা রমণী মাটীর দিকে চক্ষু নমিত করিলেন। ব্যাধি কাতর বাদসাহের স্মৃতি ক্রমে ক্রমে সজীব হইল, একে একে অনেক কথা মনে পড়িল। রণস্থলে সুলতানার অনাহূত করুণা, নিজে বাদসাহের দুহিতা হইয়া, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, স্বহস্তে তাহার সেবা—এ দৃশ্য স্বার্থময় পৃথিবীতে বিরল। সম্রাট ভাবিলেন, রাজ্য ভ্রষ্ট হইলেও খোদা তাহাকে যে অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যের ভাবী অধিকারী করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহার নিকট শত পারস্যের মসনদ কিছুই নহে; তাহার পর যে মহাত্মা তাঁহাকে নিদ্রা ঘোরে এই অলোক সামান্যা সুশীলা মহিলার প্রতিকৃতি দেখাইয়াছিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে শতবার তস্‌লিম জানাইলেন। করদরাজ বাহরাম শত্রু-রূপে দণ্ডায়মান হইয়া সুলতানা শিরীকে দেখাইয়া যে মহদুপকার করিয়াছে, তাহার বিনিময়ে ইস্পাহানের

রাজচ্ছত্র অবাধে তাহার মস্তকে প্রদান করা যায়, সম্রাটের মীমাংসায় ইহাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

সম্রাটকে একটু প্রকৃতিস্থ দেখিয়া বিমর্ষা সুলতানার মুখে আবার আনন্দের রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি একটা নূতন বেহেস্তের অধিকারিণী হইবার আশায় মনে মনে নানা প্রকার সুখের ছবি আঁকিতে লাগিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সে দিন পলায়িত বাহরাম হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়াই পারস্যের দিকে ছুটিয়া গিয়াছিল। তখন ইস্পাহানের দুর্ভেদ্য দুর্গ শূন্য ; শান্তি রক্ষার্থ মাত্র কয়েকজন বীর নগর মধ্যে অবস্থান করিতেছিল। সহরের আনন্দ কোলাহল যখন থামিয়া গিয়াছিল, দেশবাসী যখন গভীর নিদ্রার কোলে আশ্রয় লইয়াছিল, তখন সেই নিশীথ রজনীতে বাহরাম মাত্র পাঁচ শত অশ্বারোহী লইয়া পারস্য আক্রমণ করিল কিন্তু একদল রণনিপুণ সেনা ও শত্রুর সম্মুখীন হইয়া বাধা দিবার অবসর পাইল না। শিশু মাতার অঙ্কেই ঘুমাইতেছিল ; গৃহস্থের শয্যা গৃহের দ্বার তেমনি অর্গলবদ্ধ রহিল। রাজচ্ছত্র অন্য একজনের মস্তকের শোভা বর্দ্ধন করিতে প্রস্তুত হইল ; রাজপ্রাসাদ অনন্যোপায় হইয়া আত্মসমর্পণ করিল ; বক্ষের রক্তলোলুপ দুষমনকে বাধা দিতে অগ্রসর হইয়া মন্ত্রীবর সীপার বিদ্রোহী বলিয়া শৃঙ্খলিত হইলেন ; তাঁহার ভাগ্য বিচারাধীন।

[illegible]।

এ দিকে সেনাপতি আলী হোসেন রোস্তম খাঁকে পরাস্ত ও বশীভূত করিয়া, রাজধানীর অভিমুখে অশ্বচালনা করিয়াছিলেন। হতাবশিষ্ট বিজয়ী সৈন্যগণের সহিত হর্ষোন্মত্ত সৈন্যাধ্যক্ষ পারস্যের দিকে বায়ুবেগে অগ্রসর হইতেছিলেন। হৃদয়ে আনন্দ পারাবার, চক্ষে সাফল্যের স্থির জ্যোতিরেখা ও শিরোদেশে উন্নত শিরস্ত্রাণ বিজয় গর্ব্বে স্ফীতবক্ষ সেনাপতির অনেক ভাবী আশার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল। রাজার সম্মান রক্ষা করিয়া, পারস্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিয়া,রণজয়ী বীর প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এ সংবাদ অগ্রেই রাজধানীতে প্রেরিত হইয়াছে। সমর ক্লান্ত সৈন্যগণ পারস্যের সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল ; কিন্তু পারস্যের শত দুর্গের মধ্য হইতে একটীও আনন্দ সূচক তূর্য্যধ্বনি শুনা গেল না, কেহ তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিল না, স্বয়ং বাদসাহ অগ্রসর হইয়া রণজয়ী সেনাপতির গলে মতির মালা দোলাইয়া দিলেন না। এ সংশয় সমুদ্রের কূলে উপনীত হইয়া আলী হোসেন ক্ষণকাল কি চিন্তা করিলেন। দুর্গের চূড়া হইতে স্বাধীনতার পতাকা অপহৃত হইয়াছে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সেনাপতি তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। প্রজার মুখে অস্পষ্ট আন্দোলন তাহাকে আরও বিষণ্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। উপস্থিত কি করা কর্ত্তব্য

নির্ভীক আলী হোসেন তাহারি চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেশ যে শত্রুর করতলগত তাহা বুঝিতে আর বাকী রহিল না, সম্রাটের ভাবনায় তাহাকে বড় কাতর করিয়া তুলিয়াছিল। এই সামান্য সৈন্য লইয়া প্রবল অরাতিকে বাধা দেওয়া উচিৎ কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে সৈন্যগণকে দূরে অবস্থান করিবার আদেশ দিয়া সেনাপতি ইস্পাহানের দ্বিরদ-রদ নির্ম্মিত তোরণ দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহসা একটা প্রস্তরফলকে পারস্য ভাষায় বড় বড় করিয়া কয়েক ছত্র লেখার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল "খোদাতালা এই জেলকদ তারিখে যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে পারস্যের শাসনভার অর্পণ করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাট পলায়িত, রাজ্যচ্যুত, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বর্ত্তমান বাদসাহ জাহাঙ্গীর বাহরাম সাহের পাঞ্জা ব্যতীত কেহ রাজদরবারে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

আলী হোসেনের মস্তকে যেন শত বজ্রাঘাত হইল। সেনাপতি ঘৃণায় ক্ষোভে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন, একবার মনে করিলেন, যে ঘৃণিত কপটাচারী পারস্যের পুণ্য মসনদে অধিরূঢ় আছে, এই দণ্ডে তাহাকে নামাইয়া আনিয়া সম্রাট খসরুর পদতলে নিক্ষেপ করেন।

যে সিংহাসনে মহাত্মা আর্ত্তজারিসের বীর্য্যশালী বংশধর উপবেশন করিতেন, আজ কি না একটা নগণ্য করদ ভূপতি সেই পবিত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট! ইস্পাহান কি শ্মশান হইয়া গিয়াছে? ন্যায়নিষ্ঠ সম্রাট এতদিন যে পুত্রের ন্যায় প্রজাপালন করিয়া আসিয়াছেন, তাহার ঋণ কি পারস্যবাসী আজ সামন্তরাজ বাহরামকে তসলিম জানাইয়া পরিশোধ করিতেছে? প্রশ্নের পর প্রশ্নে প্রভু-প্রাণ বিশ্বাসী সেনাপতি অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিলেন কিন্তু অনর্থক এই সামান্য সেনা লইয়া দুষমনকে বাধা দিতে গিয়া কতকগুলি লোকক্ষয় করিতে তাঁহার একান্ত অনিচ্ছা ছিল। হৃদয়ের ক্রোধ হৃদয়েই পোষণ করিয়া সেনাপতি অশ্বের মুখ অন্য[ত্র]পথে চালিত করিলেন।

বেলা অবসান প্রায়। অশ্ব বল্গা শমিত করিয়া ইস্পাহানের পার্শ্ব দিয়া ভগ্ন হৃদয় সেনাপতি ম্লান কাতর স্বদেশের মুখশ্রী দেখিতে দেখিতে যে দিক হইতে আসিতে-ছিলেন আবার সেই দিকেই অগ্রসর হইলেন। পারস্যের নির্মেঘ আকাশে যখন গাঢ়মেঘের সৃষ্টি হইয়াছে, সিংহের আবাস যখন শৃগাল অধিকার করিয়াছে, তখন কে জানে নিয়তি পারস্যের ভবিষ্যত পটে কি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন?

আনন্দ কোলাহল পূর্ণ রাজধানী আজ যেন একটা

মৃত স্তূপ মাত্র। মন্দার-কানন যেন দানবের পরুষ অত্যাচারে শ্রীভ্রষ্টা। 'দেব-শক্তি লইয়া যদি কোন বীর্য্যবান পুরুষ অগ্রসর হইতে পারেন, দৈবীমায়ায় যদি দানবী ইন্দ্রজাল ভেদ করিতে সমর্থ হয়, তবেই আবার পারস্যের উত্থানের আশা আছে নতুবা 'যাবচ্চন্দ্র দিবাকর' ভীরুতার শ্লেষস্বর ইস্পাহানকে শুনিতে হইবে' ইত্যাদি চিন্তা করিতে করিতে আলি হোসেন উন্মাদ প্রায় হইয়া অনির্দ্দিষ্ট পৃথিবীর এক দিকে অশ্ব ছুটাইয়াছিলেন। পারস্য সম্রাট কোথায় কি অবস্থায় আছেন তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করাও কঠিন, বিশেষতঃ এখন ইহা শত্রুর রাজ্য, তাহারা সহজেই বিপন্ন হইতে পারেন। সেনাপতি ঊর্দ্ধে কাতর-দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন "কোন পথে যাব আমি বুঝতে পাচ্ছি না, তুমিই পথ দেখায়ে দাও কৃপাময়। বড় সঙ্কটে পড়ে তোমায় ডাকছি খোদা, এ বিপদ হ'তে উদ্ধার কর।"

একটী অজাত-শশ্রু যুবক অশ্বারোহণে রাজপথ দিয়া দ্রুত গমন করিতে করিতে সেনাপতির অশ্ব পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার শঙ্কিতভাবে চারিদিকে চাহিয়া লইয়া তাহাকে অভিবাদন জানাইল। আলী হোসেন কৌতুহলা-

ক্লান্ত হইয়া অশ্ব বল্গা শমিত করিলেন। যুবক সলজ্জ-চিত্তে একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অতিশয় সৌজন্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল "বেয়াদবি মাফ্ করবেন, আমি কোন রাজনৈতিক সংবাদ নিয়ে এসেছি। আপনার নামই কি সেনাপতি আলী হোসেন ?"

নম্রভাবে বীরবর সে কথার সমর্থন করিলেন। বিস্ময়ে সন্দেহে তাঁহার হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। যুবক পুনরায় প্রশ্ন করিল "আপনার নিকট কি সম্রাট খসরুর বিশ্বাসের নিদর্শন স্বরূপ তাহার নামাঙ্কিত কোন অঙ্গুরীয় আছে ?"

সেনাপতি স্থির থাকিতে পারিলেন না; আবেগে বলিয়া ফেলিলেন "এই লও যুবক অঙ্গুরী! এখন আমায় বিশ্বাস ক'র্‌তে পার ত ?"

সেলাম করিয়া যুবক মৃদু হাসিতে হাসিতে আংটীটা গ্রহণ করিয়া স্বীয় পাগড়ি হইতে একটা মোহর করা লেপাফা সেনাপতির হস্তে প্রদান করিল বলিল, "বীরাগ্রগণ্য হোসেন সাহেব! আজ পারস্যের বড় বিপদ! পারস্য সম্রাট মুরীবেস্নুর রণস্থল হ'তে আজও ফিরেন নাই, জানি না খোদা তাহার পরিণাম কি করিয়াছেন। বিশ্বাসঘাতক বাহরাম পারস্যের সিংহাসনে

ব'সেছে। অধিক কথা বল্‌বার সময় নাই, চতুর্দ্দিকে শত্রু। প্রভুভক্ত মন্ত্রীবর সীপার শৃঙ্খলিত—তাহারি ইঙ্গিতে আমি নারী হইয়াও আজ অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া এরূপ দুঃসাহসের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। শুনিলাম কোহিস্থানের সুলতানা পারস্য সম্রাটের সাহায্যার্থে তাঁহার বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন—যাও বীরশ্রেষ্ঠ! পারস্যাধিপের সন্ধান লইতে এখনি অগ্রসর হও; শয়তানের হস্ত হ'তে পারস্য উদ্ধার কর। এখন আর ভাব্‌বার সময় নাই।" এই বলিয়া ছদ্মবেশী বালক অশ্বে কশাঘাত করিল।

বিস্ময়ান্বিত সেনাপতি ডাকিল "ছদ্মবেশী যুবক। তুমি কে বলিয়া যাও!"

দূরে অশ্ব হইতে মস্তক ঘুরাইয়া উত্তর করিল "আমি নারী—বাঁদী সেরিনা।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

"তবে আর কিছু চাই না। যাক্ পারস্যের সিংহাসন, তোমার বক্ষে স্থান লইয়া সম্রাট খসরু পর্ণকুটীরে বাস করতে পারে।" বলিতে বলিতে সম্রাট অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন। স্থিরা চপলার সৌন্দর্য্য তাহাকে আত্মহারা করিয়া তুলিয়াছিল।

সরলা কুমারীর হৃদয় গুমরিয়া মরিতেছিল, যেন বলিতেছিল 'নিষ্ঠুর! তুমি পুরুষ, তুমি রমণীর হৃদয় জান না।' কিন্তু বুদ্ধিমতী সুলতানা ক্ষণিক মোহে আত্ম-বিস্মৃত হইলেন না। তাহার ওষ্ঠপ্রান্ত ফুলিয়া উঠিল, চক্ষে দিব্য জ্যোতি দেখা দিল; কণ্ঠ পরিস্কার—উচ্চ। তিনি স্থির ভাবে বলিলেন "যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তি যদি কখনও কাল ধর্ম্মের আবর্ত্তনে হীনতার পরিচয় দেয় কিন্তু আত্মসম্মানে আঘাত লাগিলে তাঁর মানসিক শক্তি শতগুণে বর্দ্ধিত হয়। পারস্য সম্রাট! আপনি যেই দেবতা—সেই দেবতা! প্রাণের উন্মাদনা আপনার নিভে যায় নাই। ক্ষণিকের মোহে আত্মবিস্মৃত হওয়া উচিৎ নয়।

আজ যদি একটা অবসাদে, একটা তুচ্ছ রমণীর জন্য পারস্যের আশা ত্যাগ করেন, তা' হ'লে শুধু আপনার হীনতার ভীরুতার পরিচয় দেওয়া হয় না, আমার ও পিতৃ-পুরুষের সম্ভ্রম নষ্ট করা হ'বে, পারস্যের ইতিহাস কলঙ্কিত করা হ'বে।"

সম্রাট আকাশের দিকে চাহিলেন; তখন অরুণালোক প্রকাশিত হইতেছিল। কি জানি কি ভাবিয়া তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন 'নারী তোমরা—তোমরা ঘুমন্ত পরাজিত পারস্য সেনানীকে জাগিয়ে তুলেছ, রণরঙ্গিনী রূপে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা হ'য়েছ, আর আমি পুরুষ হ'য়ে নিশ্চেষ্ট! এ অবিমৃষ্যকারিতার জন্য আমায় ক্ষমা কর সুলতানা!"

একটু হাসিয়া সুলতানা বলিলেন, "জানেন তো সম্রাট, কত রণভূমে, জয় পরাজয়েব বিচারেব দিনে, যে দিকে ন্যায়ের অধিকার অক্ষুণ্ণ রয়েছে সেই দিকে মোস্লেম রমণী শাণিত কৃপাণ হস্তে দাঁড়িয়েছে। আমরা নারী শক্তিহীনা নই। কেবল রংমহলের লক্ষ দাসী বাঁদীর সেবা লইতে শিখি নাই; আমরা সমস্ত সুখ দুঃখ বিপদ আপদের সঙ্গিনী।"

সম্রাট আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন; বলিলেন

"খোদার আশীর্ব্বাদে আজ আমি নীরোগ, আর বিলম্ব করব না, আজই পারস্যে অভিযান করব, শত বাহরাম একত্র হ'লেও মুহূর্ত্তে ধ্বংস হ'য়ে যাবে।"

নতমুখে সুলতানা শিরী বলিলেন "পারস্য সম্রাট আমার বাহিনীর সাহায্য নেওয়া কি অপমানকর মনে করেন ?"

"এ যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য না পেলে আমার উত্থান—" সম্রাট কি ভাবিয়া অসামঞ্জস্য ভাষায় বলিলেন "না থাক্—হাঁ তোমার দুর্জ্জয় বাহিনী আমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করবে, আর—"

"বন্দেগী জাঁহাপানা! বান্দা একটা খবর নিয়ে এসেছে" দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রহরী অপেক্ষা করিতে লাগিল। সম্রাট তাহাকে গৃহ মধ্যে আসিতে আদেশ করিলেন। প্রহরী সসম্ভ্রমে বাদসাহের হাতে একখানা পত্র প্রদান করিল। পত্রখানা পাঠ করিয়া সম্রাট হর্ষবিহ্বল হইয়া বলিলেন "যাও, সসম্মানে সেনাপতিকে এখানে নিয়ে এস। সাহজাদী ! আজ বিধাতা সময়ে একটা মহাবল পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমার প্রধান সেনাধ্যক্ষ আলী হোসেন অন্য একটা যুদ্ধে নেতৃত্ব কর্ত্তে গিয়েছিল, যুদ্ধ জয় ক'রে বীর ফিরে এসেছে।"

"পরিশ্রান্ত বীরের সেবার ভার আমি অন্য কারো হাতে দিব না,—আমি—"

"না মা—আমার অপরাধ নিবেন না. আজ আদব-কায়দা দোরস্তের দিন নাই, আজ শ্রম দূর করবার অবসর নাই, আজ সময় বড় অল্প, তাই বিনা অনুমতিতে অবোধ সন্তান গৃহে প্রবেশ ক'রেছে—লাখ লাখ ভস্‌লিম।"

বাদসাহ ও শিরী উভয়ে বিজয়ী বীরকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার পর কত দুঃখের ইতিহাস আরম্ভ হইল। কত কৌশল, কত পরামর্শ, কত রণনীতির আলোচনা চলিতে লাগিল। পরিশেষে আজই পারস্যে অভিযান করা হইবে নির্দ্ধারিত হইল। সুলতানার একান্ত অনুরোধে সেনাপতি কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম লাভে সম্মত হইলেন; ততক্ষণ সৈন্যসজ্জা হইতে লাগিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সম্রাট খসরু নূতন উদ্যমে সৈন্য সজ্জিত করিয়া পারস্য অবরোধ করিলেন। বীর হৃদয় জয় আশায় নৃত্য করিয়া উঠিল; শত্রুর শোণিত পিপাসু তরবারির বৃথায় মুহূর্ত্ত কালহরণও অসহ্য বোধ হইল। আলী হোসেন স্বয়ং বাহরামকে বন্দী করিবে বলিয়া বাদসাহের অনুমতি লইল। সেই ভীম আক্রমণের পর পারস্যের মাতৃশ্রী তনয়ের বক্ষে মুখ লুকাইয়া অভিমানভরে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। পারস্য সম্রাটও সাধের ইস্পাহানের ভূমি চুম্বন করিয়া মাতৃঋণ যে অপরিশোধনীয় তাহার প্রমাণ দেখাইয়াছিলেন। সে দিনকার যুদ্ধে যাঁহার পারস্য তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিল। মাতা পুত্রে বহুদিনের পর অপূর্ব্ব মিলন সংঘটিত হইল!

মসনদে সম্রাট খসরু, সম্মুখে অত্যাচারী বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহী বাহরাম শৃঙ্খলিত। জল্লাদের সুতীক্ষ্ণ খড়্গে তাহার মস্তক দ্বিধা হইয়া, রাষ্ট্রবিপ্লববাদীর শোচনীয়

পরিণাম স্মরণ করাইয়া দিবে, সে বিষয়ে কাহারও সংশয় ছিল না। বিচারমণ্ডপে অধিষ্ঠিত ন্যায়পরায়ণ ভূপের সম্মুখে আজ বাহরামের শেষ পরীক্ষা হইয়া যাইবে। রাজসভায় শত্রু বন্দী অবস্থায় প্রাণদণ্ডেরই প্রতীক্ষা করিতেছে। সমস্ত ওমরাহগণ এই পরপীড়ক, অকৃতজ্ঞ দুষ্মনের মৃত্যুর অভিনব যন্ত্রণাদায়ক উপায়ের উদ্ভবে ব্যস্ত। এমন সময় সম্রাট স্বয়ং সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া স্বহস্তে বন্দীর শৃঙ্খল খুলিয়া দিলেন। বলিলেন "বন্দি! তোমাকে আমি মুক্ত করে দিলুম—তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করলুম কিন্তু তথাপি যেন মুসলমান মুসলমানের বিরুদ্ধে খড়গ তুলেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে একথার জঘন্য উল্লেখ না থাকে। পারস্যের সিংহাসনে আমি বসলে তোমার কিছুমাত্র ক্ষোভের কারণ নাই। আমি রাজা হ'লেও পারস্যের উপর তোমার যথেষ্ট অধিকার আছে। আমরা যে পরস্পরের ভাই!"

এই কথা শুনিয়া সভাগৃহ একবার চমকিয়া উঠিল। ক্রূর প্রকৃতি বন্দীর হৃদয়ও আর্দ্র হইয়া গেল। সব খলতা বিস্মৃত হইল; অপরাধীর প্রাণে অনুতাপ আসিল। বাহরাম করুণ ভিক্ষার্থীর সজল নয়নে, তার মতন শয়তানকে যিনি ক্ষমা করিতে পারেন, তাঁহাকে একবার দেখিয়া

লইল। তার পর কম্পিত হস্তে মস্তকের উষ্ণিষটী সম্রাটের পদতলে রক্ষা করিতে গিয়া কৃতজ্ঞতার অশ্রুজলে চরণমূল ধৌত করিয়া দিল। ছল ছল নেত্রে বাদসাহও তাহাকে টানিয়া লইয়া দৃঢ় আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিলেন। আনন্দ-অশ্রুসিক্ত স্তব্ধ সভাগৃহ লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের "ধন্য ধন্য" শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল। সেই দিন হইতেই বাহরাম সম্রাটের একজন রাজভক্ত প্রজা বলিয়া পরিগণিত হইল। মুরীবেন্দু ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের আধিপত্য বাদসা নামদার তাহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। বাহরাম জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত না কি এই বিশ্বাস ভঙ্গ করে নাই।

* * * *

অশ্রুকণায় হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। পারস্যের কালমেঘ কাটিয়া গিয়াছে। অত্যাচার প্রপীড়িত প্রজাবৃন্দ আবার ন্যায়ের শাসন দেখিতে পাইয়াছে। ইস্পাহান জুড়িয়া আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। কুসুমমালায় সুশোভিত রাজপথের দুই পার্শ্বে উচ্চ হর্ম্ম্যরাজি। নগরের স্থানে স্থানে কারুকার্য্য খচিত তোরণদ্বার, জাতীয় উৎসবের দিনে সুকুমার বালকগণের হস্তে সুবর্ণময় জয়পতাকা, আর গীতবাদ্যের অফুরন্ত আনন্দ হিল্লোলে ইস্পাহান

আজ আত্মবিস্মৃত হইয়াছে। মুক্ত হৃদয় সম্রাট আজ অকাতরে রাজকোষ খুলিয়া দিয়াছেন। দেশের শত শত দরিদ্র কাঙাল, কৃপাপ্রার্থীর বাঞ্ছা পূরণ হইয়া গিয়াছে। তাহারা উদর পূরিয়া আহার ও অঞ্জলি পূরিয়া অর্থ লইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। রাজপ্রাসাদে রাজধানীর বন্ধু ও সম্ভ্রান্ত সজ্জনের অনুরোধ নিমন্ত্রণ পড়িয়াছে। মিত্র রাজগণও সখ্য সূত্রে আবদ্ধ স্বাধীন নৃপতিবৃন্দ সসম্মানে এই উৎসবে যোগদান করিতে আহূত হইয়াছেন। কোহস্থানের রাজকুমারী মালেকা শিরীও সম্রাটের অনুরোধ অমান্য করিতে পারেন নাই, রাজ অন্তপুরের সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বৈতালিকের ললিত ঝঙ্কার থামিয়া গিয়াছে, পারস্যের পুণ্য অভিষেক শেষ হইয়াছে। বাদশাহী তক্তে খসরু সাহ ন্যায়ের দণ্ডধারণ করিয়া উপবিষ্ট হইয়াছেন। সম্মান অভিনন্দন লইয়া আমন্ত্রিত আমির ওমরাহগণ স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন, দেশব্যাপী পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছে।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

মেদিনীবক্ষে অফুরন্ত জোৎস্না। সে জ্যোৎস্নার শেষ নাই, সীমা নাই। জ্যোৎস্নার রজতধারায় জগৎ ডুবিয়া গিয়াছে। সদ্যস্নাতা সিক্তবসনা রূপসী প্রকৃতি প্রমোদ যামিনীতে লজ্জাবাস ফেলিয়া দিয়াছে—হাসির স্রোতে সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর ম্লানিমা মুছিয়া আসিয়াছে, কেবল জগতের বক্ষে একটা আবেগময়ী আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া আছে। সবই যেন চাঁদের কিরণ-রাজ্যের আত্মহারা পথিক! সে জ্যোৎস্নায় তটিনী হাসিতেছে, অদূরের কোমলাঙ্গী অপরাজিতা নবাগতা সলজ্জা কুলবধূর ন্যায় মুখের মৃদু হাসি শত চেষ্টায়ও লুকাইতে পারিতেছে না। স্বচ্ছ বাপী নীরে ননদী স্বামী সোহাগিনী কুমুদিনীর দিকে চাহিয়া "দেখ তোমার বরের উপদ্রব" বলিয়া অবগুণ্ঠনটা আরও একটু টানিয়া দিতেছে।

ফিরোজা রংয়ের রেশমী পেশোয়াজটী পরিধান করিয়া, পারস্যের রাজোদ্যানে কে এক লাবণ্যময়ী রমণী পদচারণা

করিতেছেন, আর এক এক বার অনূঢ়া "কামিনীর" দিকে চাহিয়া চাহিয়া হাসিতেছেন। তীব্রগন্ধ বকুল পরিণত বয়স্ক যুবক, বংশ মর্য্যাদা আছে, বিদ্যাবুদ্ধি না থাকিলেও বড় নম্র এবং পর কামিনীর প্রতি তার যেন একটা অনেক দিনের অনুরাগ, যুবতীর নির্ব্বাচনে বকুল বরের অনুপযুক্ত নয়। তিনি "কামিনীর" তলায় গিয়া ক'নের আভাষেও কোন আপত্তি দেখেন নাই, বিশেষতঃ এমন জ্যোৎস্না আর কখনও উঠে নাই! তখন কামিনী ফুলের এক ছড়া মালা বকুলের শাখায় বাঁধিয়া দিয়া, বকুল ফুলের রচিত হারটী কামিনীর ডালে পরাইয়া রমণী বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে বলিলেন "নব দম্পতীর জীবন সুখময় হউক!"

তখন পশ্চাৎ হইতে কে তাহাকে যেন ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে বলিল "আশীর্ব্বাদিকাও এখন আপনার জীবন সুখময় করিতে পারেন!"

একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া আগন্তুকের দিকে চাহিয়া যুবতী একটা কামিনী শাখার ফুলগুলি ছিন্ন করিতে-লাগিলেন, আর আগন্তুক যুবক কোথাও কোথাও তরু-পল্লব মধ্য দিয়া নিঃসৃত জ্যোৎস্না হসিত সেই অনিন্দ্যা মোহিনীর মুখখানি অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় দেখিতেছিলেন, অপলক চক্ষু দর্শন লালসা দমন করিতে পারিতেছিল না।

শিল্পী-মন্মহাদ ।

শিরায় শিরায় বাসনার আগুণ ছুটিয়া ছুটিয়া দগ্ধ করিতে-ছিল। সুঠাম ললাট দেশে, নীলাভ আঁখিতে, বক্ষেও নিতম্ব-চুম্বী কেশের আগায় চূর্ণ জোৎস্না,—কি মনোরম! কত সুন্দর! যুবক নীরবে দাঁড়াইয়াছিলেন; অনেকবার বলিবার অবসর পাইয়াও, মনে মনে অনেক কথা গাঁথিয়া রাখিয়াও, তিনি কেমন সহসা ভুলিয়া গেলেন! একবার একটা কথার উত্থাপন করিতে গিয়া কেমন গোল করিয়া ফেলিলেন। যুবক এবার একটু স্থিরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "দেশে শান্তি ফিরে এসেছে, এখন তোমার অভিমত কি সাহজাদী?" পরে একটু হাসিয়া বলিলেন "এমন ক'রে কি একজনকে আশা দিয়া—"

চকিতে রমণী একবার যুবকের দিকে চাহিলেন, নম্র আঁখি আবার নমিত হইল। সে চাহনির ভাষা আছে, নীরবে আত্মপ্রকাশ করিবার শক্তি আছে! সে দৃষ্টি রমণীর সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বড় স্পষ্টভাবে বলিতেছিল 'তোমাকে আমার অদেয় কি আছে যে তুমি আমার অভিমত জিজ্ঞাসা করছ? কিন্তু কি করব—বাবা মৃত্যু-কালে বলে গেছেন "আমার মেয়ের অষ্টাদশ বৎসরে বিবাহ হ'বে" এখনও দুই বৎসর বাকী। পিতৃ আজ্ঞা

লঙ্ঘন করতে আমি একান্তই অক্ষম। তোমায় কি ব'লে বুঝাব ? তুমি উপেক্ষায় উড়িয়ে দিবে।'

অধৈর্য্য যুবক অঙ্গুলি দংশন করিতে করিতে বড় কাতর স্বরে পুনরপি বলিতে লাগিলেন "তবে কি রাজনন্দিনী আমি বৃথা প্রলোভনে প্রলুব্ধ হ'য়েছি ?"

"না জাঁহাপানা, বাঁদী প্রতারণা জানে না।"

যুবকের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি হর্ষ গদ্‌গদ্‌ স্বরে উত্তর করিলেন, "এই চাঁদের রাতে, খোদার নাম নিয়া বল শিরী তুমি আমায় ভালবাস ?"

দুইটী ক্ষুদ্র ওষ্ঠ একবার কাঁপিয়া উঠিল, কম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিলেন "বাসি। কিন্তু—" সন্দেহ দোলিত যুবকের হৃদয়ের আশাচন্দ্র আবার মেঘাচ্ছাদিত হইল, তিনি সোৎসুক্যে বলিলেন "কেন এখনও কিসের বাধা, কতদিন ত কেটে গেছে, আশায় আশায় পথ যে বড় দীর্ঘ বলে বোধ হচ্ছে। তুমি আমায় ভালবাস, তবে কেন আমি তোমার পাণিগ্রহণ করতে পারব না ?"

রমণী সম্রাটের অলক্ষ্যে বসন প্রান্তে এক বিন্দু অশ্রু মুছিলেন। বাদসাহ আবার বলিতে লাগিলেন "যদি তুমি অসন্তুষ্ট হও, পারস্য সম্রাট এত সংকীর্ণমনা নয়— রাজনন্দিনী ! বাদসাহ একজনকে ভালবেসেছে, সে তুমি;

তুমি করুণা না কর, আমি অকৃতদার থাক্‌ব। এ হৃদয়ে আর কা'রো স্থান নাই।"

সুলতানা সকলি শুনিতেছিলেন। এ সমস্যা তটিনীর উপকূলে দাঁড়াইয়া তাঁহার কিছু উত্তর করিবার ক্ষমতা ছিল না। গভীর প্রেম লইয়া একজন ডালি দিতে আসিয়াছেন, মন যাঁহার দাসত্ব কিনিয়া লইয়াছে, তিনি বুঝি অভিমানে ফিরিয়া যান! কি করা উচিৎ? কি করি? পায়ে ধরিয়া সাধিব? বলিব, 'আমার উপর রোষ পরিত্যাগ কর আমার কিছু দোষ নাই।—দুদিন সবুর কর।' কেন শুন্‌বেন? মনে মনে নিশ্চয় সন্দেহ কর্‌বেন। তবে কি করি? একটা মিথ্যা কথা বলে দুই বৎসর সময় কাটাতে পারব না? খোদা! দোষ নিও না, অভাগিনী বড় বিপদে!" বাদসাহ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া অভিমান ভরে সে স্থান ত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন "তবে এখন আসি সাহজাদী! আমি মূর্খ তাই স্বর্গৈশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা ক'রেছিলাম!"

শিরী ক্ষণকাল বাদসাহের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। বাদসাহ চক্ষু ফিরাইতে তাহার চক্ষে চক্ষু পড়িল। তিনি সরমে দৃষ্টি নামাইয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন "জাঁহাপানা! আমার একটা ইচ্ছা ছিল।"

আবেগপূর্ণ স্বরে সম্রাট উত্তর করিলেন "তোমার ইচ্ছা? বল শিরী কি সে ইচ্ছা? দুনিয়ায় এমন কি আছে যে তুমি ইচ্ছা ক'রে পারস্য সম্রাট তা সঞ্চয় করতে পারে না। পারস্যের রাজ্য সম্পদ, পারস্য রাজের হৃদয়, তোমার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করতে বিলম্ব করবে না।"

ধীরে ধীরে শিরী উত্তর করিলেন "ইউক্রেটিসের তীরে মর্ম্মর প্রস্তরের নূতন মহল প্রস্তুত হ'বে, নাম দেবো "নূরমহল"! নহর ব'য়ে পীযুষধারা আমার রত্নময় কক্ষে গড়া'য়ে পরবে,—তবে আমি এমনি একদিন জ্যোৎস্নার রাতে সাধের 'নূরমহলে' প্রেম-পারিজাতের হার গেঁথে পারস্য সম্রাটের গলায় পরিয়ে দে'ব, নারীজন্ম সার্থক করব।"

"এই কথা! পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর দিয়ে আমাদের নূতন মহল তৈরী হ'বে। আমার হৃদয়-রাণী চঞ্চলা পক্ষিণী সেই দিনের আনন্দ নিশীথেই না হয় আমাকে ধরা দিবে।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

"নেসারত!

"ভাই!"

"তুমি এখনও ব'সে আছ?"

"আছি।"

"অনেক রাত হ'য়েছে, কারা সহরের কেউ জেগে নাই। তোমার ছেলে মেয়েরা এখন তোমার আশাপথ চেয়ে হয়ত ব'সে আছে। কেন ব'সে আছ বন্ধু!"

"সে কথা কেন জিজ্ঞাসা কর্‌ছ, তার উত্তর নাই। তুমি কাজ কর্‌ছ, ক'রে যাও আমি তোমায় দেখি!"

"রোজ রোজ আমায় দেখে আপনার কাজ ভুলে গিয়ে কি শান্তি পাও বন্ধু!"

"দুনিয়ায় এত শান্তি আর কিছুতেই পাই না।"

"কারাবাসী আমায় পাগল বলে। আমার কথার অর্থ নাই, হেসে উড়িয়ে দেয়। তুমি কি দেখেছ ভাই, কিসে মজেছ?"

"ফরহাদ! এখনও সে কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছিস্? দুজনে দুচার দিনের অগ্রপশ্চাৎ এই পৃথিবীতে এসেছি। তুই খোদার কৃপায় আজ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারীকর। আর

আমি তোর বাল্যবন্ধু, এই আমার একমাত্র গৌরব। দেখারও দেখেছে তুই তস্বির আঁক্তে আঁক্তে তাতে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছিস্, আর সেই তস্বিরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে কত দীর্ঘ রজনী কাটিয়ে দিয়েছিস্। আমি লক্ষ্য ক'রেছি তুই তা'দিগকে অসীম ভালবাসায় বুকের মধ্যে স্থান দিয়েছিস্।"

"পাগল!"

"তুই যাই বল না ফরহাদ, আমি একটা সরল প্রাণ ল'য়ে ক্রীড়া ক'রেছি, ভালবাসার মাধুর্য্য আমি বুঝ্তে পারি নাই। আমার কর্কশ আচরণে, পরুষ ব্যবহারে সে আমায় ত্যাগ ক'রে গেছে। আর এই ত্যাখ্, তোর সঙ্গে পাথরের কত ভাব, কত অচেনা রাজ্যের পাখীর সঙ্গে মিতালী। তোর কাছে আমি প্রেম মন্ত্রে দীক্ষিত হ'ব। ফরহাদ! দুনিয়ার কাকেও ভালবাসিস্?"

"দূর্! হাসি পায় দুনিয়ায় তেমন সুন্দর হয় না!"

"কে ভাই—সে কোথায়?"

"সে কেউ খুঁজে পাবে না, সূর্য্য তাঁর মুখ দেখ্বে না, ধরিত্রী তাঁর নিশ্বাস টুকুও অনুভব কর্বে না। সে কেবল আমারি! আমিই তাঁর দর্শক, আমিই তাঁর রক্ষক! আমিই, তাঁর একমাত্র পূজারী। আমার হৃদয় ছাড়া

তাঁর থাক্‌বার গৃহ নাই। সে ভিন্ন আমার বুকে আর কারো স্থান নাই। সে হাস্‌লে আমি হাসি, সে কাঁদলে আমি থাক্‌তে পারি না। তার কত রূপ! আমি তাকে যে ভাবে দেখ্‌তে ইচ্ছা করি, সেই ভাবেই সে চোখের আড়ালে দেখা দেয়। ঐ যে সে আমার পাশে ব'সে ব'সে মৃদু তিরস্কার কচ্ছে "এত রাত হ'ল এখনও ঘুমালে না?"—না ভাই, সে রাগ কর্‌ছে, আর আমি তস্‌বির আঁক্‌তে পারব না।"

"এত প্রলাপ! এত ভালবাসা!"

"নেসারত! তুমি তবে যাও। ঐ শুন তার চরণ-মঞ্জীর বড় স্পষ্ট শুনা যাচ্ছে—সে বোধ হয় রাগ ক'রে রোষের ঘরে কবাট দিল। তুমি তার অভিমান জান না, আমি অনাহারে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিয়েছি, তবু তার মান ভাঙ্গতে পারি নাই। যাও, কাল সকালে একবার দেখা ক'রো"

"সত্যি ফরহাদ, প্রেমের মর্ম্ম বুঝেছিস। কাল সকালে যাব, আচ্ছা আমি খুব ভোরে আস্‌ব।"

এই কথা বলিতে বলিতে ফরহাদের গৃহ প্রাঙ্গন অতিক্রম করিয়া নেসারৎ কারা সহরের সেই ক্ষুদ্র পল্লীপথ ধরিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল।

নেসারত কারা সহরের এক মহাজনের গোমস্তা। সে বুদ্ধিমান। ফরহাদের সহিত বাল্যকালে এক সঙ্গে উলঙ্গ অবস্থায় নৃত্য করিয়াছে। সে বন্ধুকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে। সুতদার নেসারত আর বিবাহ করে নাই। ফরহাদের ভালবাসা দেখিয়া সে আপনার প্রেমের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে। ভাবুক ভাস্কর রাত্রি জাগিয়া তার কল্পনার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিত, আর বন্ধু সন্ধ্যার সময় আসিয়া তাহারি পার্শ্বে একটা আসন টানিয়া লইত। বেশী রাত হইলে সে দিন আর সে গৃহে যাইত না, ফরহাদের কবিত্বময় কথাগুলি শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িত।

ফরহাদের ভালবাসা সকলের উপর, সে হৃদয় শঠতা করিতে জানিত না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ফরহাদ যাহা উপার্জ্জন করিত তাহার অধিকাংশই পরহিতার্থে ব্যয়িত হইত। আর কখন কখন বাজারে নিজের আহারীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে গিয়া রিক্ত হস্তে কেবল ফুলের রাশি লইয়া সেই প্রেমোন্মত্ত যুবক গৃহে ফিরিয়া আসিত। মুখে কিছু না দিয়াই, ফুলের কণ্ঠহারে, নিজেকে সজ্জিত করিত। নিজে সাজিয়া নিজেই মুগ্ধ হইত—আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইত।

সময়ে সময়ে ফরহাদকে কার্য্যানুরোধে বিদেশে যাইতে

হইত কিন্তু সে নিজের কুটীরের জন্য, পাড়ার ছেলে মেয়েদের জন্য, স্বহস্ত রচিত কারুকার্য্য শোভিত প্রস্তর ও ফুলের গাছগুলির জন্য দুই বিন্দু অশ্রু না ফেলিয়া কখন কোথাও যাইতে পারিত না। তাই আজ রাত্রে শয্যার আশ্রয় লইল না। রজনী প্রভাতেই তাহাকে পারস্যের রাজধানী ইস্পাহান অভিমুখে যাত্রা করিতে হইবে। বাদসাহের দরবার হইতে বিশ্বস্ত দূত জরুরী পত্র লইয়া আসিয়াছে। সে সম্রাটের আজ্ঞার অবমাননা করিতে পারে না। পত্রের নির্দ্দেশ মত কল্য প্রভাতেই তাহাকে কারা ত্যাগ করিতে হইবে। তাহার অনেক কাজ। সে রাত্রে আর কি সে ঘুমাইতে পারে? পুষ্পভরা গাছগুলির গোড়ায় জল দিতে হইবে, গৃহ প্রাঙ্গনে কত পাথরের লতা, পাথরের পুষ্প—সকলের কাছে বিদায় লইতে হইবে। পাড়ার ছেলে মেয়েদের জন্য খাবার প্রত্যেকের নামে নামে গণনা করিয়া রাখিতে হইবে, তবে ত সে বিদায় পাইবে।

ঐ শুক্তারা দেখা যাইতেছে, ফরহাদের গৃহে তখনও আলো জ্বলিতেছে। সে গৃহমধ্যে বসিয়া রোদন করিতেছে। সম্মুখে তাঁহার মানস প্রতিমা। প্রেমিক চিত্রকর বুঝি তাহার ভাব সমুদ্র মন্থন করিয়া এই একটী মাত্র প্রতি-

মূর্ত্তিই লাভ করিয়াছে। আর হয় না—শত চেষ্টা করিলেও এর মতন আর একটা গড়া যায় না। তাই বিরহ কাতর শিল্পী একটা দীর্ঘবিচ্ছেদের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। কি অনাবিল ভালবাসা! হৃদয়ের বিনিময় নাই, একটা সান্ত্বনা বাক্য নাই, পলকহীন চোখের একটু চঞ্চলতা নাই, কখন লাভ করিবার আশাও নাই, স্বার্থ-গন্ধ নাই। এই ত প্রেম! উষার আলো দেখা দিয়াছে ; যাত্রা করিবার সময় আসিয়াছে। ফরহাদের চোখের অশ্রুসিক্ত পল্লব তখনও শুষ্ক হয় নাই ; সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "খুব শীগ্‌গীর আস্‌ব, তোমাদের ছেড়ে আমি কি কোথাও থাক্‌তে পারি ? এখন বিদায় দাও।" আবার চক্ষু দুটী জলে ভরিয়া আসিল। এমন সময় একদল বালক বালিকার কলরব শুনা যাইতে লাগিল। কেহ ফরহাদের কুটীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর নিক্ষেপ করিতেছিল, কেহ দ্বারে মৃদু করাঘাত করিতেছিল, আর কেহ "ও দাদা! বেলা কি হয় নাই ?" বলিয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিতেছিল। ফরহাদ "এই যে ভাই !" বলিয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিল। তারপর সকলকে মিষ্টান্ন দিয়া প্রস্থানের আয়োজন করিতে লাগিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বলিতে ভুলিয়াছি দেলেরা সাহজাদীর সঙ্গেই পারস্যে আসিয়াছে। ক্ষুদ্র কোহস্থানের সহিত ইস্পাহানের তুলনা করিতে গিয়া সে প্রায়ই সেরিনার কাছে পরাস্ত হইত। কখন কখন তাহাদের তর্কের মীমাংসা হইত না, বিচারকের কর্ণে গিয়া পৌঁছিত। সুলতানা হাসিয়া উভয়েরি আর্জ্জি গ্রহণ করিতেন। সেরিনার প্রমাণ অনেক সময় অপক্ষপাতী বিচার কর্ত্রীর নিকট জয়লাভ করিত। ইহাতে দেলেরা যে দুই একটা অসুখকর কথাব উল্লেখ না করিত, তাহা নহে। রাজনন্দিনীর ন্যায় বিচারে সে নিঃসন্দেহ নহে। পারস্যের "খোসবাগ" কোহস্থানের "জুমলি" বাগিচার কাছে কিছুই নহে ইত্যাদি নানা কথা সে হারেমের অন্যান্য বাঁদীদিগেব কাছে বলিত।

অন্য দিনের ন্যায় আজও একটা বিবাদের বিচার ভার সাহজাদীর হস্তে পড়িয়াছে। বাদী, প্রতিবাদী উভয়েই উপস্থিত। বাদীর সাক্ষী বলিল "সেরিনা বিবি সেনাপতির কন্যা 'রেজিনাকে' মন্ত্রী কন্যা 'সোফিয়ার' চেয়ে অধিক

সুন্দরী বলায় প্রতিবাদিনী পূর্ণ এক ভৃঙ্গার গোলাবে তাহার পরিধের বসন সিক্ত করিয়া দিয়াছে।"

প্রতিবাদিনী কতকগুলি মিথ্যা সাক্ষীর আয়োজন করিয়াছিল। তাহারা সেরিনার স্কন্ধে মিথ্যা দোষ চাপাইতে গিয়া চতুর বিচারপতি কর্তৃক ধৃত হইল। অপমানিতা দেলেরা যখন অভিমানভরে সাহজাদীর কক্ষ ত্যাগ করিতেছিল, তখন রেজিনা আসিয়া সুলতানাকে কুর্নিস করিল। রেজিনা নবনীত কোমলা সরলা কুমারী, শিক্ষা সহবতে অনেক বর্ষীয়সী অপেক্ষাও উন্নতি লাভ করিয়াছিল। সে প্রায়ই বাদসাহের রংমহলে সাহজাদীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। রেজিনা পারস্যরাজের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের কন্যা। তিনি কন্যাকে, ধর্ম্মতত্ব, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সঙ্গীতে উচ্চশিক্ষিতা করিয়াছিলেন, তাহার উপর তাহার রূপের প্রশংসাও যথেষ্ট ছিল। মিষ্টভাষিণী রেজিনা একদিন যাহার সহিত আলাপ করিত, সে তাহাকে জীবনে মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিত না। সুলতানা তাহাকে বড় ভালবাসেন। কখন কখন ডাকাইয়া আনিয়া তাহার মুখের দু একটা সুমধুর গান শুনেন। রেজিনা আজ কয়দিন আসে নাই বলিয়া সাহজাদী শিরী রংমহলের প্রহরিনীর সহিত তাঞ্জাম পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। রেজিনা

আসিয়া কুর্নিশ করিয়া আসন গ্রহণ করিল। দেলেয়ার দিকে একবার বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া রাজনন্দিনী হাসিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিলেন "রেজিনা! তোকে আর সোফিয়াকে এক জায়গায় দাঁড় করালে কাকে বেশী সুন্দর দেখাবে?"

সদা হাস্যাননা রেজিনা উত্তর করিল "একজন পুরুষের উপর তার বিচার ভার!"

সকলেই মুখে রুমাল দিয়া হাসিতে লাগিল। দেলেরাও একথায় না হাসিয়া থাকিতে পারে নাই।

সাহজাদী আবার বলিলেন "দেলেরার চোখে সোফিয়া তোর চেয়েও খবসুরৎ, তুই কেমন বুঝিস্?"

মরালগ্রীবা হেলাইয়া বীণা বিনিন্দিত কণ্ঠে রেজিনা উত্তর করিল "সমঝদার বটে, আমি ওর গলেই মালা দিব।"

আবার একটা হাসির স্রোত বহিল। দেলেরা মুখে কাপড় দিয়া সে স্থান হইতে পলাইয়া গেল। সাহজাদী হাসিয়া বলিলেন, "তোর জ্বালায় দেলেরা এখানে টিক্‌তে পারে না।"

"কি করব সকলের বরাতে ত আর রমণীরত্ন মিলে না।"

"এখন একটা গান কর্। ও সব কথা ছেড়ে দে।"

"গাইব ? আচ্ছা, কি রকম ?"

"গানের আবার রকম কি ? একটা ভাল গান গা।"

ছুরিয়াকা মালিক খোদা,

বড় মেহেরবান।

শিরী বাধা দিয়া বলিলেন "ও গান, তোকে কে গাইতে বলে, আর একটা গা"।

মৃদু হাসিয়া রেজিনা উত্তর করিল "আগেই ত বলেছিলাম"

অপ্সরা কণ্ঠে রেজিনা গান ধরিল—

"কতদিন মোর হৃদয় মাঝারে

ধরেছি তোমারে প্রভু,

ভেবেছি অভাগী আমি এ জনমে

পাব কি তোমারে কভু ;

(কত) উষার শিশিরে, প্রদোষ সমীরে,

নিশার তিমিরে জাগি,

ধাইতাম বনে, সৈকতে, প্রান্তরে,

তুঁহার দরশ লাগি।

রেজিনার মধুময় সঙ্গীতে সকলেই তন্ময় হইয়াছিল, সকলেই এক মনে গান শুনিতেছিল ; বাহিরের দিকে কেহই দৃষ্টি করে নাই। দু একটা অভিবাদন, অস্ত্রের ঝনৎকার, বাঁদী প্রহরিণীর তস্‌লিম, সঙ্গীত মুগ্ধা রমণীগণের

কর্ণে একটুও প্রবেশ করে নাই। "জহরা" রংমহলের শেষ কক্ষ, এই দ্বার দিয়াই শাহজাদীর হারেমে প্রবেশ করিতে হয়, একটী একটী করিয়া সাতটী দ্বার অতিক্রম করা হইল, তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই, সঙ্গীতের স্বর ক্রমেই উচ্চে উঠিতেছিল। সুলতানার কক্ষের খোজা প্রহরী কাহাকে দেখিয়া সহসা দুই পদ পিছাইয়া গেল, তাহার পর ফিরে অসি স্পর্শ করতঃ কহিল "সালামৎ জাঁহাপানা" প্রকোষ্ঠ মধ্যে এই কথার মৃদু ঝঙ্কার শাহজাদীর কাণে গিয়াছিল, তিনি চক্ষু ও অঙ্গুলি সঙ্কেতে রেজিনাকে গান বন্ধ করিতে ইঙ্গিত করিলেন কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই সম্রাট খসরু সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন, বলিলেন "রেজিনা, তোমার কণ্ঠ তো বেশ মিষ্ট, থামলে কেন, লজ্জা কি, গাও ; গানের শেষ চরণটা বাদ দিও না। সঙ্গীত বড় পবিত্র, এতে সঙ্কোচের কোন কারণ নাই।"

লজ্জায় রেজিনার গণ্ডস্থল আরক্তিম হইয়া উঠিল কিন্তু সে বাদসাহের কথার অবমাননা করিতে পারিল না।

—(শুনি) মলয়ের পদধ্বনি, তব আগমনগণি,
চমকিয়া তুলিতাম মুখ ,
(তব) সমস্নিগ্ধমেঘস্বরে, সমদীপ্তারুণ করে
দুরু দুরু কাঁপিত এ বুক ,

সে তুমি আমার নাথ, হেরি তোমা দিনরাত,
তবু যেন ভরে না পরাণ ;
(আজ) তোমার আলোক যায়, জগৎ ডুবিয়া যায়,
গগন হইতে যায় গান।”

সম্রাট রেজিনার সঙ্গীতের ক্ষমতা দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলেন ; বলিলেন “রেজিনা ! রোজ সন্ধ্যাবেলা তুমি একবার করে শিরী বিবির হারেমে দেখা দিও।”

রেজিনা শির নত করিয়া সে আদেশ যে অমান্য হইবে না তাহা প্রকাশ করিল। সহচরীরা অন্তঃকক্ষে চলিয়া গেল, রেজিনাও তাহাদের অনুগমন করিল। বাদসাহ শিরীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন “সাহজাদী ! ভাস্কর এসেছে, তোমার ইচ্ছামত নূতন মহল প্রস্তুত হ'বে ; সে তোমার নিকট হইতে কিছু আভাষ নিতে চায়।”

শিরী জানিতেন তাঁহার মনোমত প্রাসাদ ও নহর নির্ম্মাণ করিবার ক্ষমতা কোন শিল্পির নাই। একটা কল্পনা গঠিত অট্টালিকা ও নহরের নির্ম্মাণ কার্য্য যত জটিল হইতে পারে তিনি তাহার একটাও বাদ দিবেন না, ভাস্কর অসম্ভব বলিয়া ফিরিয়া যাইবে, তিনিও কোনরূপে সময় কাটাইয়া পিতৃ আদেশ পালন করিতে পারিবেন, এই উদ্দেশ্য লইয়াই ইক্রেটিসের তীরে রাজগৃহ ও নহরের

অনাবশ্যকীয় অবতারণা করিয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহার এ অভিসন্ধি বুঝিতে পারেন নাই। সময়ক্ষেপ করাই সুলতানার উদ্দেশ্য। তিনি আত্মগোপন করিয়া, ভাস্করের আগমন সংবাদে যেন বড় আনন্দিত হইয়াছেন, এরূপ ভাবে বলিলেন "জাঁহাপনা। যাঁহার জন্য অনেক ক'রেছেন, যদি দিন আসে সে ঋণ পরিশোধ করতে বিমুখ হ'বে না। কোথায় ভাস্কর?"

"দেখ, তোমার মর্জ্জি।" পরে পার্শ্বের কক্ষে উপবিষ্ট ভাস্করকে তথায় লইয়া আসিবার জন্য প্রহরিকে আজ্ঞা করিলেন।

অল্পক্ষণ পরে এক বলিষ্ঠ দেহ প্রশস্ত ললাট যুবক সেই গৃহে প্রবেশ করিল। সে সম্রাটকে কুর্নিশ করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু একবারও বাদসাহের খাস কামরার শোভা সৌন্দর্য্য দেখিবার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয় নাই; কিম্বা নিরক্ষর সামান্য শিল্পী সম্রাটের প্রকোষ্ঠে কিছু দেখিবার আছে বলিয়াও অনুমান করে নাই। সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। সম্রাট কহিলেন "সাহজাদী! এই ব্যক্তি চীনরাজ্যের সর্ব্বপ্রধান কারীকর-ফরহাদ। শিল্পী তোমার নিকট নূতন মহল্লা ও চশমা তৈরীর বিবরণ শুনতে চায়।"

সেলাম করিয়া ভাস্কর এ কথার সমর্থন করিল।

শাহজাদী মনে মনে একবার হাসিলেন। ধরা পড়িবার ভয়ে সংযতস্বরে বলিতে লাগিলেন "তোমার প্রস্তরের কার্য্যের আমি প্রশংসা শুনেছি। আমার 'অমরধাম' ইউক্রেটিসের তীরে নির্ম্মিত হ'বে। এক এক প্রাকারে এক একটা হুরীর মূর্ত্তি স্তম্ভরূপে দণ্ডায়মান থাকবে। দুনিয়ার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাসাদ বলে যেন গুমর করতে পারি। অন্তঃপুরের স্নানাগার দিয়ে কল্লোলিনী ইউক্রেটিস যেন সদাই প্রবাহিত হ'তে থাকে। ভিতরের একটী গৃহে অজস্রে কৃত্রিম নন্দন কানন হ'তে নীলকান্তমণির নহরে সূর্য্যকান্ত-মণির ময়ূর-মুখ দিয়া অবিরল ধারায় দুগ্ধ নিঃসৃত হ'বে—"

রাজনন্দিনী যখন ভাস্করকে নহর ও প্রাসাদ নির্ম্মাণের কথা বলিতেছিলেন, তখন তাহার দৃষ্টি সুলতানা শিরীর চরণপদ্মের দিকে সংশ্লিষ্ট ছিল। আনত চক্ষু ফরহাদ ঐ পা দুখানিতেই যেন দুনিয়ার ঐশ্বর্য্য দেখিতে পাইল। ফরহাদ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে সুদূর কাস্রা হইতে ইস্পাহানে আসিয়াছে। আরও দু একবার খসরুশাহের কার্য্যানুরোধে পারস্যে আসিয়া সে প্রভূত অর্থ ও সম্মান লাভ করিয়াছিল। তাহার সচ্চরিত্রতার প্রমাণ পাইয়াই বাদশাহ আজ তাহাকে রংমহলে আনিয়াছেন—এ সৌভাগ্য সকলের

ভাগ্যে ঘটে না। ফরহাদের কিন্তু অন্যবারের ন্যায় এবার কার্য্য বিবরণ ভাল করিয়া শুনে নাই। কি জানি কেন সে অন্যমনস্ক, তাহার চক্ষু স্থির, মুখমণ্ডল গম্ভীর। সে আশৈশব নীরব প্রকৃতির সাধনা করিয়া আসিয়াছে, মিসরের অপূর্ব সুন্দরীগণকেও সে প্রশংসা করে নাই। আজ তাহার চক্ষুর ভাবান্তর দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ভাবুক ভাস্কর কল্পনা রাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে যে মানস প্রতিমার এতদিন সাধনা করিয়া আসিয়াছে পৃথিবীতে যে মনগড়া মূর্ত্তি ভিন্ন অন্য জানে না, আজ সে এক রমণীর কেবল মেহেদীরঞ্জিত পা দুটী দেখিয়া কঠোর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে বসিয়াছে। কি অশুভ মুহূর্ত্তে আজ সে রংমহলে পদার্পণ করিয়াছে। যে সুধানিঃস্রাবী বীণা-ধ্বনি লাঞ্ছিত কলকণ্ঠের অপার্থিব স্বরলহরী সে কেবল এতদিন একটা অলীক চিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, আজ যেন তাহা নরজগতে রক্ত অস্থিময়ী নারী মূর্ত্তিতে বাদশাহের হেরেমে বিরাজ করিতেছে। সে কি আর অচঞ্চল থাকিতে পারে? চিরকুমার ফরহাদ দীর্ঘ বৎসরের পর বৎসর হৃদয় মন্দিরে যাঁহার মূর্ত্তি আঁকিয়া হাস্য অশ্রুবর্ষণ করিয়াছে, কে জানিত সে আরাধ্য প্রতিমা ইস্পাহানের রাজপ্রাসাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী!

তাহার চক্ষু উন্মুক্ত হয় নাই, যাহা দেখিয়াছিল তাহা দেখিয়াই রহিল। সুবর্ণময় কল্পিত, আত্মবিস্মৃত হইল। প্রাণ ভুলিয়া গেল, এখনও [illegible] জীবন বিপন্ন হইতে পারে তাহার মনে নাই। বাদশাহ অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়াছেন, [illegible] কিন্তু তখনও যেন সে স্বর সুধা ঢালিয়া দিতেছিল। বাদশাহের কিছু মনে নাই। পৃথিবীর কথা মনে নাই, [illegible] কথা মনে নাই, [illegible] কথা মনে নাই, আর যাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইতে অশ্রুসংবরণ করিতে পারে নাই, তাহাদের কথাও ভুলিয়া গিয়াছে। সম্রাট কখন তাহাকে সে স্থান ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন সে তাহা শুনে নাই। প্রহরী আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বাদশাহের আদেশ জানাইল, সেই গৃহ হইতে বাহিরে লইয়া গেল। যাইতে যাইতেও সে অনেকবার সে পা দুখানির দিকে চাহিয়াছিল। প্রহরীর চক্ষে সে একবার করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কি যেন কি ভিক্ষা করিয়াছিল। তাহার সজল আঁখির নীরব প্রার্থনা বোধ হয় উপেক্ষিত হইয়াছিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

ফরহাদ আজ তিন মাস ইস্পাহানে আসিয়াছে। কারার কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার আনন্দ কুটীরে শত শিশুর মিলিত প্রমোদ নৃত্য, প্রভাতে সহস্র বন বিহঙ্গিনীর মধুর কলরব, আর অকপট সোদর আবাল্যের প্রিয় সুহৃৎ সেই দরিদ্র নেসারতকেও বিস্মৃত হইয়াছে। আজ সে তাহার মানসী প্রতিমাকে জীবন্ত পাইয়া তাঁরই সেবায় আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিতে বসিয়াছে।

শিরী বিবির কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইয়া ফরহাদ কি করিতে যে রাজ অন্তপুরে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা মনে করিতে পারে নাই। তাহার কেবল একটী কথা মনে ছিল "দুনিয়ার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাসাদ বলে যেন গুমর করতে পারি।" সুলতানার আদেশ প্রতি সে তত লক্ষ্য করে নাই, সে কেবল তাহার অপ্সরকণ্ঠের মাদকতা মাখা স্বরের মধ্যে তাহার সমস্ত চিন্তাকে ডুবাইয়া দিয়াছিল।

যে কল্পনাময়ী ছবি লইয়া সে সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়াছে যাহার কথা ভাবিতে ভাবিতে কত বিনিদ্র রজনীর সুদীর্ঘ

সময় অনবসন্ন চিত্তে কাটাইয়া দিয়াছে, যাহার অভিমানে সে পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছে, যাহার হাস্যমুখ কল্পনা করিয়া পৃথিবী ফুলময় ভাবিয়াছে সেই মৃগ-তৃষ্ণিকা যদি আজ স্বপের সলিল সম্পূর্ণ সরিৎরূপে দেখা দেয়, কেন সে পান করিতে ছুটিয়া যাইবে না ? যাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া ছুটিয়া তাহার কণ্ঠ পিপাসায় শুষ্ক হইয়াছে, প্রান্তরের পর প্রান্তর, কান্তারের পর কান্তার অতিক্রম করিয়া সে যে স্বর্ণ বিহঙ্গিণী অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছে ; আজ সে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অঙ্গভঙ্গী করিতেছে, তাহার বাসনাকুল প্রাণখানিকে আরও মাতাইয়া তুলিতেছে, কেন তবে সে তাহাকে হৃদয় পিঞ্জরে ধরিয়া রাখিতে ছুটিয়া যাইবে না ? কেন তবে সে তাহার জীবনের সাধনা সফল করিতে চাহিবে না ?

ফরহাদ তিন মাস ধরিয়া "নূরমহল" নির্ম্মাণ করিতেছে। কতবার গড়িতেছে, ভাঙ্গিতেছে, মনোমত হইতেছে না। সুন্দর শরীর স্তম্ভ তৈয়ারী হইয়াছে, কেবল চক্ষু দুটী আকর্ণ বিস্ফারিত হয় নাই, তাই সে সেটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। সে যদি রাগ করে, তাহার চক্ষু যদি ইহাই যথেষ্ট নয় বলিয়া প্রচার করে, তবে তাহার পরিশ্রমের প্রয়োজন কি ? সে অর্থ চাহে না, প্রশংসা চাহে না, চাহে

কেবল ঈপ্সিতের সন্তুষ্টি। তাহার একটা কারুকার্য্যও যদি তাহার মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সে আপনাকে ধন্য মনে করিবে।

সার্দ্ধ ছয় মাসের পর ফরহাদ নূতন মহলের কার্য্য শেষ করিতে পারিল। একটী মর্ম্মর প্রস্তরময় উচ্চ গিরি খোদিত হইয়া যেন এই প্রাসাদটী সৃষ্ট হইয়াছে। আর নহরের মুখে দুগ্ধধারা একটা দেখিবার জিনিষ। মুক্তাময়ী ময়ূরী নৃত্যভঙ্গে ফুৎকারে ফুৎকারে চতুর্দ্দিকে দুগ্ধধারা ছড়াইয়া দিতেছে। বাদসাহ ও সুলতানা শিরী একদিন নূতন মহল দেখিতে আসিয়া একবাক্যে ভাস্করের প্রশংসা করিলেন। সাহজাদীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও শিল্পীর কার্য্যে দোষারোপ করিতে পারিলেন না। অধিকন্তু এক এক স্থানে ভাস্করের কার্য্য তাঁহার কল্পনাকে পরাজিত করিয়াছে। সাহজাদী সন্তুষ্ট হইয়া অদূরে দণ্ডায়মান ফরহাদকে নিজ কণ্ঠ হইতে বহুমূল্য মতির হার উন্মোচন করিয়া পুরস্কার স্বরূপে প্রদান করিলেন। দরিদ্র ভাস্কর তাহা সসম্মানে গ্রহণ করিয়া একবার মস্তকে ও বক্ষে স্থান দিল। ইহা কেহ লক্ষ্য করে নাই। ফরহাদ ঐ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে বড় পরিশ্রম করিয়াছিল। আজ এক লহমায় তাহার পরিশ্রম সফল

হইয়াছে—সুলতানা তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া মতির হার উপহার দিয়াছে। মহামূল্য পারিতোষিক পাইয়াই তাহার আনন্দ নয়—তাহার আনন্দ শাহজাদী সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার কণ্ঠের প্রিয়হার, তাঁহার সহবাসপূত মণিমালা আজ সে স্পর্শ করিতে পারিয়াছে। সামান্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া ইহাপেক্ষা লোভনীয় পুরস্কার দুনিয়ায় আর কিছু আছে বলিয়া তাহার ধারণা হয় নাই।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

কোথায় মহিমময়ি! কোথায় মহিমময়ি!
শান্ত-শুভ্র-দীপ্ত-তারকা স্বর্গরাজ্য জয়ী!
নয়নে তোমার সুধার নিঝর, হে মোর মানস প্রতিমা!
নীহার-সিক্তা মুগ্ধা সেফালি অঙ্গে উছলে গরিমা।
ধ্যানের শিরি! জ্ঞানের শিরি! শিরি অন্তরের!
আশার আমার—পূজার আমার—দৃষ্টি দর্শনের!

এরূপ প্রাণস্পর্শী ভাবময় গান গাহিতে গাহিতে এক চীরবাস পরিহিত দেওয়ানা ইস্পাহানের প্রসিদ্ধ রাজপথ দিয়া গমন করিতেছিল; তাহার চক্ষে অশ্রুধারা, কণ্ঠস্বর ঈষৎ কম্পিত। তখন সবে মাত্র অভ্রস্পর্শী হর্ম্ম্যগুলির শিরোদেশে প্রভাত সূর্য্যের রক্তিম কিরণধারা পতিত হইয়াছে। রাজপথের দুই পার্শ্বস্থিত গৃহগুলির অধিকাংশই তখনও অর্গলবদ্ধ। কুত্রাপি যুবকের মধুর কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া দু একজন ত্রিতলের বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া এই পথবাহী দেওয়ানার করুণ অভিব্যক্তিটী শ্রবণ করিতেছিল।

ক্রমে বেলা হইল। রাজপথে জন সমাগমের বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নানা লোকে এই যুবকের সম্বন্ধে নানা কথার উত্থাপন করিল। কেহ বলিল "যুবক এক-জন দরবেশ ছিল। এখন মাথায় বিকার ঘটেছে।" কেহ বলিল "চীনের সাহজাদা ছদ্মবেশে দেশ ভ্রমণ কর্‌ছেন।" কেহ বলিল "পুণ্য মক্কা শরিফে এই যুবককে আমি এক-দিন দেখেছি।" আর কেহ সঙ্গীর কাণের নিকট মুখটী নিয়া মৃদুস্বরে বলিল; "দোস্ত্! এ আর বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? শুন্‌ছ না! শিরী শিরী কচ্ছে—আমাদের সম্রাট খসরু সাহ যে বেগমটীকে সাদী কর্‌তে অন্তঃপুরে এনেছেন, এই যুবক তাঁরই প্রতি একান্ত আসক্ত।" তার পর তাহারা একটী কথা এত নিম্নস্বরে বলিয়াছিল যে শুনা যায় নাই। "—কাজেই উন্মাদ হ'য়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

সঙ্গী হাসিয়া একথার সমর্থন করিয়া বলিল "কাজ নাই, ভাই, রাজা রাজ্‌ড়ার কথায় আমাদের দরকার কি?"

মধ্যাহ্ন। সূর্য্য মাথার উপর আসিয়াছে। যুবক তখন চীৎকার করিতে করিতে ইস্পাহানের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া দুই একজন দয়ালু ব্যক্তি কিছু অর্থ দিতে গিয়াছিল। সে

তাহা গ্রহণ করে নাই। কেবল সেলাম জানাইয়া পৃথিবীতে তাহাপেক্ষা যে অনেক দরিদ্র আছে, এই অর্থে তাহাদের অনেক উপকার হইবে, এই কথা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছিল। কোন সদাশয় ব্যক্তি কিছু আহারীয় লইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিল—এক খণ্ড পিষ্টকও স্পর্শ করে নাই, একটু পানীয় ও গলাধঃকরণ হয় নাই। সে অর্থ ও আহারের প্রলোভনে বড় সহর ইস্পাহানের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে না।

"নূরমহলের" নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলে, সম্রাট ফরহাদকে প্রভূত পুরস্কার দিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ করেন। সে রাজবাটী হইতে বাহির হইয়া পথে আসিয়া দাড়াইল; বাদসাহ প্রদত্ত আরবী অশ্বটী ছাড়িয়া দিল, রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ প্রশস্ত পথের অনতিদূরে দাড়াইয়া সেদিনকার দীর্ঘ রজনী অনাহারে কাটাইয়া দিল। তাহার অপলক নেত্রের দৃষ্টি প্রাসাদের গবাক্ষ বিশেষের উপর যেন স্থির হইয়া দাড়াইয়াছিল। কাহার বারেক দর্শন আকাঙ্ক্ষায় যেন সেই প্রত্যাবর্ত্তনমুখ ভাস্কর আকুল প্রতীক্ষায় সময় অতিবাহিত করিতেছিল। একদিন দুইদিন করিয়া তিন দিবস অতীত হইল। ফরহাদ এক

ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। সে চোখের স্পন্দন নাই, হৃদয়ের কিছু ভাষা নাই। আহারের ইচ্ছা নাই, শয়নের প্রয়োজন নাই—পদতলে মৃত্তিকার উপর হাজার স্বর্ণমুদ্রা, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। এক মুহূর্ত্ত বসিলে যদি সে তাহাকে দেখিতে হারায়, তাই সে তিন দিন উঠা বসা করে নাই। আঁখির পলক ফেলিলে যদি সে আসিয়া চলিয়া যায়। তাই সে দণ্ডের পর দণ্ড, প্রহরের পর প্রহর এক দৃষ্টে চাহিয়াছিল।

সন্ধ্যা না আসিতেই প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হইল, মাথার উপর জলের ধারা, জনশূন্য রাজপথে ফরহাদ একাকী। শীতে দেহ কম্পমান সারারাত্রি সে বৃষ্টিতে ভিজিয়াছে। প্রভাতে আর সে দাঁড়াইতে পারিল না। তিন দিন অনশনে ক্ষীণ হস্তপদ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল--সে মাটীর উপর পড়িয়া গেল। অনন্ত প্রেম লইয়া যুবক এই প্রতারণার রাজ্যে আসিয়াছে। একটী মাত্র প্রতিমাকে সে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছে, যাহার একবার মাত্র দর্শনের জন্য সে পৃথিবীর সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। তিনটা দিন কিছু মুখে দেয় নাই, মাথার উপর দিয়া সারারাত্র বৃষ্টিধারা চলিয়া গিয়াছে, সে কিন্তু সে কষ্টের দিকে একবারও ফিরিয়া চায় নাই।

সে তার সম্বল প্রাণটুকু সাধিয়া সাধিয়া আকাঙ্ক্ষিতার পদতলে রাখিতে যাইতেছে। আর কেন সে তাহাকে অবজ্ঞা ভরে পদাঘাত করিয়া দূরে ফেলিয়া দিতেছে? সে সব দিয়া ভিখারী সাজিয়াছে, অনশনে মরিতে বসিয়াছে, তবু কি একবার তাহার দেখা মিলিবে না? তবে আর বাঁচিয়া লাভ কি? মরিতেও তার ইচ্ছা হয় না—মরিলে যে তাহাকে দেখিতে পাইবে না। চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু অন্ধ প্রায়—আর তাহার কি আছে, সবই তো উৎসর্গ করিয়াছে!

রাজপথের প্রাণহীন ধূলিকণার মধ্যে মুখ লুকাইয়া অভিমানী হতভাগ্য ফরহাদ যখন এক বেলা ধরিয়া রোদন করিতেছিল, তখন একজন শান্তিরক্ষক আসিয়া তাহার পৃষ্ঠে সশব্দে কশাঘাত করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিতে বলিল। ফরহাদ করযোড়ে মিনতি করিল, তাহার হস্তে অর্থের ভাণ্ডার তুলিয়া দিল কিন্তু নির্দ্দয় প্রহরী তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। তাহাকে সহরের সীমানা অতিক্রম করিয়া দিয়া আসিল। সে রাজপ্রাসাদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে গভীর নিরাশার সহিত সে স্থান ত্যাগ করিয়াছিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

"তুমি ফিরে যাও।"

"কোথায় জাঁহাপনা ?"

"স্বদেশে।"

"স্বদেশ কাকে বলে তা আমি জানি না—স্বদেশ বলে কোন কথাও আমার মনে আস্ছে না! আমার ফিরে যাবার স্থান ত দুনিয়ার কোথাও দেখ্তে পাচ্ছি না?

"তবে তুমি কি চাও ?"

"কিছু না। দুনিয়ার রাজভাণ্ডারে সে সম্পদ নাই, আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার নয়!"

"কি বল্লে ? তুমি জান ভাস্কর, এই ইস্পাহান দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজধানী! আর এই ইস্পাহানের বাদসাহী তক্তে যিনি অধিষ্ঠিত তিনিই স্বয়ং তোমার অভিষ্ট পূরণে কৃতসংকল্প!"

"সম্রাটের এ করুণাকে আমি ধন্যবাদ দেই। কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষিত রত্ন ইস্পাহানের রাজকোষে পরিদৃষ্ট হবে না!"

"এ উন্মত্তের প্রলাপ মাত্র! আমি জানি, যারা কারীকর হয়, শিল্পে যারা প্রসিদ্ধি লাভ করে, তাদের মস্তিষ্কে

অনেক অনৈসর্গিক ভাবের উদয় হয়। যাও ভাস্কর, আমি তোমায় ইস্পাহানের রাজভাণ্ডার খুলে দিচ্ছি। তোমার যা ইচ্ছা হয়—মতি, মাণিক্য, জহরৎ, যা অভিরুচি হয় বেছে নিয়ে নিজের দেশে ফিরে যাও।"

"জাঁহাপানা! সম্রাট! আপনি দুনিয়ার মালিক। আমি ঐশ্বর্য্য সম্পদ চাই না, মতি মাণিক্য চাই না, খ্যাতি প্রতিপত্তি চাই না, আহার চাই না, শয়ন চাই না, বন্ধু চাই না—আমি চাই শিরী! আমি তাঁকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে, তাঁকে ভাব্‌তে ভাব্‌তে তাঁরি সাথে মিশে যেতে চাই! আমার শিরীর—আমার মানস-প্রতিমার মুক্তার ন্যায় দন্তপাঁতি অপেক্ষা কোন্ মতির বেশী ঔজ্জ্বল্য আছে? আমার শিরীর খঞ্জন আঁখির তারা দুটীর মত কোন্ মাণিক্যের নীলাভ জ্যোতি আছে? আমার শিরীর প্রতি অঙ্গ হ'তে বিজলীর ছটা উদ্ভাসিত হচ্ছে, মুখচন্দ্রের অমিয় ধারার সঙ্গে স্বর্গরাজ্যের সুষমা ঝড়ে পড়ছে। রূপসী প্রকৃতির ঐ অফুরন্ত হাসি আমারি শিরীর স্নেহ ভালবাসা ভরা প্রাণখানির ভাব ব্যক্ত করছে, অনন্ত আকাশে, বাতাসে, লতায়, পাতায়, ফলে ফুলে যে সৌন্দর্য্য দেখ্‌ছি তা আমার মানস প্রতিমার রূপের আলো বই আর কিছু নয়! কি অপূর্ব্ব! কি মনোরম! বিশ্ব মধ্যে এ রূপের

তুলনা নাই, ছবীর রাজ্যে এমন সৌন্দর্য্য নাই। সম্রাট! এ ঐশ্বর্য্য যে দেখেছে সে কি আর অন্য সম্পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা করে। আপনি আর কি দিবেন খাঁহাপানা, এ অপূর্ণ হৃদয় পূরণের বস্তু দুনিয়ার রাজকোষে নাই। আমায় ফিরে যেতে বলছেন সম্রাট? কোথায় ফিরে যাব? দুনিয়া ত "সাহারা" হয়ে গেছে।

আমায় এই আদেশ করুন, যেখানে আমি যুগ যুগান্তরের বাঞ্ছিত প্রতিমা দেখেছি সেই ইস্পাহানের পূর্ণ ধূলিশয্যায় যেন আমার শেষ নিশ্বাস প্রবাহিত হ'তে বাধা না পায়।"

ফরহাদ যখন দিবানিশি ইস্পাহানের পথে পথে "শিরী" "শিরী" বলিয়া পাগলের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছিল, তখন ধীরে ধীরে সে সংবাদ রাজ সভায় আসিয়া উপনীত হয়। সম্রাট খসরু এ সম্বন্ধে প্রজার যে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, গুপ্ত দূত মুখে তাহারও খবর পাইয়াছিলেন। তাই তিনি লোক লজ্জা ভয়ে, যিনি ভবিষ্যতে পারস্যের পাটরাণী হইবেন তাঁহার উপর অযথা সন্দেহের ভয়ে, ফরহাদকে রাজ সমীপে উপস্থিত করিবার আদেশ করিয়াছিলেন। ফরহাদ সম্রাটের সম্মুখে আনীত হইলে বাদসাহ তাহাকে বহু ধন মাণিক্য লইয়া কারা

স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন কিন্তু সে ইস্পাহান ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নয়।

বাদসাহ বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। কি কুক্ষণে তিনি শিরীঁর অপার্থিব সৌন্দর্য্যের নিকট এই তরুণমতি ভাস্করকে উপস্থিত করিয়াছিলেন! কি কুক্ষণেই "নূরমহলের" নির্ম্মাণ সূচনা হইয়াছিল! কিন্তু বাদসাহের হৃদয়ের সুপ্ত তারগুলি এই নিষ্কাম প্রেমিকের জয় গান করিয়াছিল। সভাসদ্‌গণ ফরহাদের এই উচ্চ প্রেমের নিদর্শন পাইয়া নীরবে প্রশংসা করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী সীপার অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। সম্রাটের হৃদয় অলক্ষ্যে উছলিয়া উঠিতেছিল।

বাদসাহ খসরু যখন মস্‌নদের উপর গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। কি করিবেন তাহার স্থির করিতে পারিতে-ছিলেন না। তখন একজন আসিয়া কুর্ণিশ করিয়া কি একটা কথা তাঁহাকে সংগোপনে বলিয়া গেল। সম্রাটের মুখে আবার হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি ইঙ্গিতে উপদেশ দাতার প্রশংসা করিলেন। ফরহাদ ভূমির দিকে মুখ করিয়া আপন মনেই ভাবিতেছিল, কাঁদিতেছিল। বাদসাহ এবার মৃদু হাসিতে হাসিতে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ফরহাদ! তোমার ভালবাসা অকৃত্রিম,

তুমি ভালবাসার জন্ত দুনিয়ার ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ করেছ, তোমার হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছি, তোমাকে আমি শিরীই পুরস্কার দিব দিব কিন্তু—”

ফরহাদ চমকিত হইল। সম্রাটের পদতলে পড়িয়া কৃতজ্ঞতার অশ্রুজলে চরণমূল ধৌত করিয়া দিল। বাদসাহের শেষ কথা শুনিবার জন্য তাঁহার মুখের দিকে সজলনয়নে চাহিয়া রহিল।

“—তোমাকে এক কাজ কর্‌তে হ’বে। সাগর মন্থন না কর্‌লে যেমন সুধা পান করা অসম্ভব, কণ্টকের ভয় ক’রে যেমন প্রস্ফুটিত গোলাব লাভ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না, তোমাকেও তেমনি শিরী লাভ কর্‌তে হ’লে ঐ দূরের পর্ব্বতমালা ভেদ ক’রে একটা প্রশস্ত পথ প্রস্তুত কর্‌তে হ’বে।............কাজ নিখুঁত হ’লে অঙ্গীকৃত পুরস্কার প্রদত্ত হ’বে। এখন যাও, আর পথে পথে পাগলের ন্যায় পরিভ্রমণ ক’রো না।”

জানু পাতিয়া ফরহাদ সেলাম করিতে করিতে খসরু সাহের সম্মান রক্ষা করিল। বাদসাহের চরিত্রে দেবত্বের ছায়া দেখিয়া আজ সরল প্রেমিক মুগ্ধ হইল। তারপর আনন্দে রাজসভা ত্যাগ করিয়া, পাথর কাটার অস্ত্র শস্ত্র কাঁধে লইয়া পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভালবাসার স্রোত একদিক দিয়া প্রবাহিত হইলেও অপর তীরটা যে অল্প বিস্তর আন্দোলিত হয় না, এমন নহে। একজন একজনের জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিলে অপরের প্রাণটা যে একটুও কাঁদিয়া উঠে না, এ কথা বিশ্বাসের যোগ্য নহে। একজন আমার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী সাজিয়াছে, আমার নাম জপমালা করিয়াছে। আমার চিন্তায় বিভোর হইয়াছে। আমায় লাভ করিবার মিথ্যা আশা পোষণ করিয়া অনন্ত সাগর পানে ছুটিয়া যাইতেছে—অনলের মুখে অগ্রসর হইতেছে। তাহার জন্য আমার হৃদয় কি একটুও বেদনা অনুভব করে না? যে আমাকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া "নিজে বনবাসী হইয়াছে" তাহার দুঃখে প্রতিদানের ইচ্ছা না থাকিলেও সহানুভূতির নামে কি দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়ে না? তাহা আর বলিতে হইবে কেন, চাতক বিশাল সমুদ্র, সচ্ছ সরিৎ, নির্ম্মল নদী থাকিতেও যখন পিপাসায় অধীর হইয়া কেবল 'ফটিক জল'

'ফটিক জল' বলিয়া সারারাত্রি কাননে বিষাদের সুর তুলিয়া থাকে, তখন অনাসক্ত জড় আকাশ ভেদ করিয়াও করুণাধারা বর্ষিত হয়।

ফরহাদ শিরীর জন্য পাগল হইয়াছে; রাজনন্দিনী তাহা শুনিয়াছেন। প্রথমে অবজ্ঞা ভরে দুঃখে ও ক্ষোভে বদন আকুঞ্চিত করিয়াছিলেন। সামান্য ভাস্করের এতদূর স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া তিনি মর্ম্মাহতা হইয়াছিলেন কিন্তু যখন শুনিলেন ফরহাদ প্রকৃত প্রেমিক, প্রেমের জন্য উন্মাদ সাজিয়াছে, ইস্পাহানের পথে পথে "শিরী আমার" "শিরী আমার" বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অনাহারে অনিদ্রায় খসরু সাহের কথার উপর বিশ্বাস করিয়া দুর্ভেদ্য পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া পথ নির্ম্মাণ করিতে ছুটিয়াছে! তখন আর নীচ উচ্চের বিচার রহিল না, প্রেমের নিকট সঙ্কীর্ণতা পরাজয় স্বীকার করিল। সুলতানার দুই গণ্ড বহিয়া জল ঝরিতে লাগিল। এ অশ্রু পবিত্র, অনাবিল। এ অশ্রু প্রণয়ীর দুঃখে বহির্গত হয় নাই, মিলনের নিরাশায় চক্ষু ফাটিয়া ঝরিয়া পড়ে নাই। এ অশ্রু একজন প্রতারিত, মর্ম্মপীড়িত, ব্যর্থপ্রেম—হতাশ প্রেমিকের দুঃখ দেখিয়া আপনা আপনিই দুই গণ্ড বাহিয়া পড়িতেছিল।

সৌধশিরে বসিয়া রাজবালা শিরী বহুদূরে একটা পাহাড়ের দিকে চাহিয়া আছেন; দেখিতেছেন—এক মলিন-বসন যুবক লোহের গুরুভার অস্ত্র লইয়া পাথরের উপর সজোরে আঘাত করিতেছে, মস্তকের উপর দ্বিপ্রহরের সূর্য্য, ললাটে শ্রম জনিত স্বেদবারি, মুখে "আমার শিরী"। বোধ হয় এই কথাই, এই মন্ত্রই তাহার একমাত্র অবলম্বন। সে দৃশ্য দেখিলে অতি পাষাণ হৃদয়েরও চক্ষে জল আসে। দ্বিপ্রহর শেষ হইয়া গিয়াছে, মুখে জল দিবার সময় নাই, রৌদ্রতপ্ত পাথরের উত্তাপে শরীর দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, তথাপি কার্য্যের নিবৃত্তি নাই—এই পাথরটার পর আর একটা পাথর কাটিতে পারিলেই তাহার একমাত্র প্রার্থনার শিরী তাহার হইবে। এক একটা লহমা এক একটা যুগ; এ দীর্ঘ বিরহ আর কি সহ্য করা যায়? ইত্যাদি ভাবিয়া আহার নিদ্রা ভুলিয়া ফরহাদ বড় মন সংযোগে পরিশ্রম করিতেছে। দৃঢ় পাথর বহিয়া হস্ত ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, শরীর অবসন্ন। ক্লান্ত ব্যথিত ফরহাদের প্রাণে যেই তাহার মানস-প্রতিমা জাগিয়া উঠিল—অমনি কোথায় বেদনা, কোথায় জ্বালা, কোথায় ক্লান্তি, সব দূর হইল; ফরহাদ আবার পূর্ণ উদ্যমে বাইস্ তুলিল!

শিরী বিবি আর এ দৃশ্য দেখিতে পারিলেন না,

বস্ত্রাঞ্চল দিয়া চক্ষু ঢাকিয়া ফেলিলেন; হৃদয়ের পূর্ণ-উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন "কি উন্মত্ত প্রেমিক—কত বড় পাগল!"

"সে ত সুলতানারই কারসাজী! তাহারি প্রেমে ফরহাদ পাগল সেজেছে। এখন হতভাগার অদৃষ্টে হলাহল না উঠলেই বাঁচি!"

সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া সাহজাদীর সম্মুখে আসিতে আসিতে রেজিনা একটু বিদ্রুপচ্ছলে এই কথাটা বলিল। রাজবালা মুখ অবনত করিয়া কি ভাবিতেছিলেন, চোখের জল টপ্ টপ্ করিয়া ছাদের উপর পড়িতেছিল। ইহা দেখিয়া রেজিনা বড় লজ্জিতা হইল, বলিল "সে কি! আপনার কি দোষ সাহজাদি! উজ্জ্বল আলোক দেখে মূর্খ পতঙ্গ অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে ঝাঁপ দিয়েছে, তার এ অদূরদর্শিতার ফল কে ভোগ করবে?"

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সুলতানা উত্তর করিলেন, "খোদার অভিসম্পাত! আমায় পুড়ে মরতে হ'বে রেজিনা! পারস্য ধ্বংশ হ'য়ে যাবে—ঐ পাহাড়ের মধ্যে রাস্তা প্রস্তুত করতে পারে—" সহসা রাজনন্দিনী নীরব হইলেন কি কথার উচ্চারণ করিতে বোধ হয় তাঁহার সাহস হইল না।

"—কিন্তু সব প্রতারণা—তুই কি জানিস্ "রেজিনা!" হাসিতে হাসিতে রেজিনা বলিল "যদি সত্য হয়, তা হ'লে সাহজাদী পারস্য সম্রাটকে ভুলে গিয়ে ঐ ভাস্করের গলায় মালা দিতে পারেন ?"

রেজিনার মুখে হাত চাপা দিয়া শিরী উত্তর করিলেন "এ পাপ কথা মুখে আনতে নাই এ হৃদয় দুনিয়ায় পারস্য সম্রাট ভিন্ন আর কাকেও চিনে না। কিন্তু ঐ দেখ রেজিনা! ঐ দৃশ্য দেখলে চোখ্ ফেটে জল আসে কিনা?"

রেজিনা অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই হৃদয়ভেদী দৃশ্য দেখিল, অলক্ষ্যে তাহার আঁখি পল্লব আর্দ্র হইয়া আসিল। সে আবেগে বলিয়া উঠিল "ঐ ত প্রেম! এমন না হ'লে প্রেমিক!" সাহজাদী আনতমুখী, কোনও উত্তর নাই।

তারপর সুলতানা কি ভাবিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "রেজিনা, একটা কথা বলব!"

"কি বেগম সাহেবা?"

"ঐ ভাস্কর যদি তোর খসম হ'ত?"

রেজিনা আকাশের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "খোদা সে ঐশ্বর্য্য, দুনিয়ার সে শ্রেষ্ঠ রত্ন আমার ভাগ্যে লিখেন নাই। অমন প্রেমিকের ভার্য্যা হ'ব এমন কি পুণ্য ক'রেছি সাহজাদী!

"কেন তোর পাণি গ্রহণ কর্‌তে সামন্তরাজগণ ও পারস্যের আমীরগণ অনেকেই উপযাচক হ'য়েছে।"

"তাদের নিকট রমণী উপভোগের—প্রেমের নয়। আর ঐ দেখ যাকে সত্য প্রেম বলে—যাকে স্বর্গ-পথের আলোক বলে—যার পুণ্য বিভায় স্বর্গরাজ্যও আলোকিত হয়—"

"আরে পোড়ারমুখি! কে জানে যে তোর ভাগ্যে সে ঐশ্বর্য্য নাই!"

সুলতানা কি বলিবার জন্য রেজিনাকে আপন কক্ষে লইয়া গেল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

নিশিদিন হাসি কাঁদি
নিশিদিন ভাবি তার।
নিশাকালে ঘুম ঘোরে
স্বপনে সে দেখা দেয় ॥
মজিয়া তাহার রূপে
মনোব্যথা ভুলে রই।
আপনা ভুলিয়া গেছি
জানি না তো তাহা বই ॥
সে আমার আমি তার
এই টুকু জানি সার।
আমার যা কিছু ছিল
ডালি দিছি পায়ে তাঁর ॥

অপরাহ্নে রৌদ্রের তাপ যখন একটু মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছিল, তখন সারাটী বনভূমি মাতাইযা উপলখণ্ড কাটিতে কাটিতে উদ্‌ভ্রান্ত ফরহাদ একটা উন্মাদনার গান গাহিতেছিল। গানের ভাষায় বিশেষত্ব না থাকিলেও

নিরাশ প্রেমিকের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া যখন আস্থায়ী অন্তরা আভোগ পর পর জগতের দ্বারে একটা দীর্ঘ বক্ষের রুদ্ধ অশ্রুকণার ম্লানিমাময়ী চিত্রালি ধরিয়া প্রেমের গভীরতা দেখাইল, তখন ফরহাদ জাগিয়া ছিল না, স্বপ্নাবিষ্ট— তখন তাহার চোখে শিরী, হৃদয়ে শিরী, সম্মুখে শিরী, পশ্চাতে শিরী, পার্শ্বে শিরী, পাহাড়ে শিরী, লতায়, পল্লবে, শূন্যে শিরী—বিশ্ব তখন শিরীময়! শিরী ভিন্ন সে তখন আর কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না। পায়ের তলা হইতে পৃথিবী বোধ হয় সরিয়া গিয়াছে, মাথার উপর হইতে অনন্ত আকাশ বোধ হয় কোন সুদূর দেশে উড়িয়া গিয়াছে। গহন কানন তরুলতার সম্পর্ক ঘুচাইয়া দিয়া বোধ হয় কেবল শিরীর মনোহারিণী প্রতিমার অনুধ্যান কবিতেছে! কেন করিবে না, তাহার শিরী যে বিশ্বের আকাঙ্ক্ষিতা! দেবতা বাঞ্ছিতা!

ফরহাদ যখন শিরীর চিন্তায় আত্মহারা হইয়া জগৎ ভুলিয়া গিয়াছিল, তখন কে যেন তাহার সে মোহকর স্বপ্ন সহসা ভাঙ্গিয়া দিল, কাহার করুণ সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় তাহাকে একটু চঞ্চল করিয়া তুলিল।

—"উদাস হইয়া কেন মর পাখী চাহ জল
বুঝ নাকি নাহি, প্রতিদান।"

এ নির্জ্জন অরণ্যে বামীকণ্ঠে তাহারি মত কোন্ হতভাগিনী নিরাবসাদে এমন বিষাদের গান তুলিয়াছে! ফরহাদের চক্ষু জল ভারাক্রান্ত হইল, সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আহা! অবুঝ চাতক যে বুঝে না!"

"সে তার নির্ব্বুদ্ধিতা।

ফরহাদ সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই দেখিল এক অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী, বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিতা হইয়া, রত্ন বলয় মণ্ডিত সুকুমার করে স্বর্ণপাত্রে সুগন্ধি সরবত লইয়া, স্মিতমুখে ভ্রূ-ধনু মৃদু কাঁপাইয়া যেন তাহার কথায় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া উত্তর দিতেছে। "সে তার নিবুর্দ্ধিতা!"

বিস্ময়ে সংশয়ে ফরহাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। সে মাটীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে?"

রমণী গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিল

"আমি পাগলিনী!"

"তোমার উদ্দেশ্য কি?"

"কি ক'রে বল্‌ব; কি ক'রে জানাব, আমার হৃদয়ের ব্যথা কে বুঝ্‌বে?"

"তুমি কি চাও?"

যুবতী এবার হৃদয়ের পূর্ণ উচ্ছ্বাসে উত্তর করিল "আমি চাই—তোমার করুণা।".

রমণী জানু পাতিয়া ফরহাদের চরণতলে বসিয়া বড় কাতরস্বরে তাহার প্রেম ভিক্ষা করিতেছিল, আর ফরহাদ চক্ষে কাপড় দিয়া এ ঘৃণিত দৃশ্যের অভিনয় দেখিতে পারিতেছিল না। ললনা কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিল "যার জন্য তোমার দেহ ক্ষীণ ক'রেছ, যাঁর ধ্যানে আহার বিহার ভুলে গেছ, সে দেখ ঐ রাজপ্রাসাদের সুখশয্যায় শান্তির ক্রোড়ে মগ্ন আছে। তাঁর হৃদয়ে তোমার চিন্তা নাই, সে বাদশাহের বাগ্‌দত্তা পত্নী। তোমার কষ্টে তাঁর কিছুমাত্র দুঃখ নাই। তুমি সারাজীবন "শিরী" "শিরী" ক'রেও শিরী কখন তোমার হবে না।"

এ কথায় ফরহাদের হৃদয়ে ক্রোধের সঞ্চার হইল কিন্তু সে তাহা দমন করিয়া ধীরে ধীরে বলিল "শিরীর চিন্তাতেই আমার সুখ, শিরীর ধ্যানেতেই আমার আনন্দ! শিরীর দর্শনই আমার স্বর্গের সিংহাসন লাভ। এই যে—এই যে শিরী আমার পাশে বসে কথা কইছে—সুধাবর্ষণ হচ্ছে। শুনতে পাচ্ছ না? এমন কণ্ঠ কা'রো নয়। তোমরা তার নিন্দা করো না, তার নিন্দা আমি সইতে পারি না। তোমার পায়ে ধরি তার নামে কিছু কথা ব'লো না। সে আমার একটুও সইতে পারে না!"

ফরহাদের হৃদয়ের উন্মত্ততা দেখিয়া রমণীর চক্ষু দিয়া

জল পড়িতে লাগিল। সে স্বগতঃ বলিতে লাগিল "এই ত হৃদয়! এই ত প্রেম!!"

ফরহাদ আবার "শিরীর" নাম লইয়া কার্য্যে মনঃ সংযোগ করিল। রমণী এবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিল। তাহার মুখের নিকট সরবতের পাত্র লইয়া গিয়া বড় স্নেহপূর্ণকণ্ঠে বলিল "আমায় উপেক্ষা ক'রো না। অনাহূতা হ'য়ে এসেছি বলে ঘৃণা ক'রো না, তোমার প্রশস্ত হৃদয়ে একটু স্থান দাও। আমি তোমার জন্য মান সম্ভ্রম ত্যাগ ক'রে আজ উপযাচিকা হ'য়ে এসেছি, আমায় বঞ্চিত ক'রো না।"

ফরহাদ সভয়ে একটু পশ্চাতে সরিয়া গেল। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল; তার পর গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিতে লাগিল "রমণি! তুমি ভুল ক'রেছ—অপাত্রে জীবন যৌবন দান ক'রেছ! এ হৃদয়ে শিরী ভিন্ন কারো স্থান নাই। ফরহাদ শিরী ভিন্ন কাকেও জানে না। তোমার রূপ আছে—ঐশ্বর্য্য আছে, এ জগতে তোমার ভালবাসা লাভ করতে অনেকেই আকাঙ্ক্ষা করবে, আমার কথা ভুলে যাও। আমি নগণ্য—সামান্য ভাস্কর মাত্র। আর যদি সত্যই তুমি আমাকে ভালবাস, তবে কেন আমাকে চাও, চকোর চাঁদকে ভালবাসে, চন্দ্র

দেখিবারই তার সুখ। মেঘলোকের মতন চায় না—মিলন চায় না, দেখিবারই তার আনন্দ। কমলিনী থাকে আকাশে তার পানে শুধু চাহিয়া থাকে, আর গাহিয়া যায় পাখি সুদূর প্রান্তে, কেন সুধা দিয়ে তার বেদনার কিছুই বুঝে। জগতে যে মিলনের পথ দিন একটু নয় যায় যায় যেমনও কেন পরিতৃপ্ত হতে পারে না কিন্তু প্রেম আমরণ বিরহি চায় না, কেবল দেখিয়াই তার সুখ। এই ত বিরহ! এই ত প্রেম! মরলোকে পতঙ্গ—দৈহিক মিলন পতঙ্গ—কিন্তু প্রেম অনাবিল, মহা নির্বাণের পথ!"

সমালোচনা শুনিয়া উচ্চ সিংহ আসনে বলিয়া উঠিল "আজ কি শুনলাম! যথার্থ এই ভালবাসা! এ প্রেম জগতে দুর্লভ। পৃথিবীর মানুষ এমন ভালবাসতে জানে না। যাও, দূরে যাও, বহুমূল্য রত্নাভরণ। এ দুষিত অঙ্গে আর তোমাদের স্থান নাই। আজ যে মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়েছি, যে আদর্শ প্রেমের কথা শুনেছি, তাতে আমার চৈতন্য হ'য়েছে—ঐ আকাশের কোলে যিনি তারার সৃষ্টি ক'রেছেন, পাখীর কণ্ঠে যিনি অমৃত ঢেলে দিয়েছেন, এ অকিঞ্চিৎকর জীবন তাঁর পদে উৎসর্গ করুন। আশীর্বাদ করুন সাধু উদ্দেশ্য যেন সফল হয়।"

এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে করহাদের চরণধূলা

লইয়া রমণী সে স্থান ত্যাগ করিল। শিরীগত প্রাণ ভাস্কর আবার শিরীর চিন্তায় নিজকে হারাইয়া ফেলিল।

পাঠক! এ রমণীকে কি চিনিয়াছেন! এ রেজিনা। সাহজাদী শিরী তাহাকে বহুমূল্য বসন ভূষণে সজ্জিতা করিয়া ফরহাদের মন আকর্ষণ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। রাজনন্দিনীর উদ্দেশ্য ছিল, রেজিনার প্রতি ফরহাদ আসক্ত হইলে তাহাদের শুভ মিলন তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া নিষ্পন্ন করিয়া দিবেন। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল না। আদর্শ প্রেমিকের হৃদয় বিচলিত করিতে হইল না—চিত্তজয়ী ফরহাদ লালসার হুতাশনে পুড়িয়া মরিল না।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

বাদসাহ খসরু শুনিলেন ফরহাদের কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। দুর্ভেদ্য গিরি বিদীর্ণ করিয়া সুপ্রশস্ত পথ নির্ম্মিত হইয়াছে। অলোকসামান্যা রূপবতী শিরীর মূর্ত্তি পথের দুই পার্শ্বে পাথরের, পদ্মের উপর স্থাপিত হইয়াছে। সম্রাট বড় চিন্তায় পড়িয়াছেন। স্বার্থে-পরার্থে দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে। বিবেক বুদ্ধি বড় ধিক্কার দিচ্ছেছে। অন্যায়ের উপর ন্যায়ের দৃঢ়তা বড় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন কি করা সঙ্গত? যাহার জন্য পারস্যের সিংহাসন তুচ্ছ করিতে চাহিয়াছিলাম তাহাকে অন্যের হাতে তুলিয়া দিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব? আর কিছুদিন পরে যে পারস্যের একমাত্র পাটেশ্বরী হইবে, তাহাকে কেমন করিয়া ছাড়িয়া দিব—কেমন করিয়া ভুলিয়া যাইব? আমার পক্ষে তাহা অসম্ভব। আবার অপরদিকে পুণ্য-ইস্পাহানের বাদসাহী তক্তে বসিয়া সত্যের অপলাপ করিলে রাজধর্ম্মের ব্যতিক্রম হয়। একজনকে বৃথা আশায়

প্রলুব্ধ করিয়া তাহাকে এত কষ্ট দিবার পর প্রতারিত করিলে তাহার এক এক বিন্দু অশ্রুজল ভীষণ অগ্নিময়ী উল্কা হইয়া পতিত হইবে।' সে অভিসম্পাতের আগুনে আমার সাধের ইস্পাহান ভস্মীভূত হইয়া যাইবে" ইত্যাদি চিন্তা সম্রাটের হৃদয়ে শত বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিতেছিল।

তারপর এক ব্যক্তি আসিল। নিস্তব্ধে সে আসন গ্রহণ করিল; বাদসাহকে নীরবে কি বুঝাইয়া দিল। সম্রাট চমকিয়া উঠিলেন; বলিলেন "না দায়ুদ! আমি সে মৃত্যু দেখ্‌তে পার্‌ব না! আহা! একজন সবল অকৃত্রিম প্রেমিক, তোমরা তার প্রেমপ্লাবিত জীবনের নাটক এইখানেই শেষ ক'রে দিও না।"

কুর্নিশ করিয়া কুটবুদ্ধি দায়ুদ উত্তর করিল "জাঁহাপনা! রাজধর্ম্ম একটু নীরস, একটু জটীল। তা' না ক'রলে রাজ্য পালন হয় না। আমি আপনার পার্শ্বচর, এ কথার বিন্দু বিসর্গও দুনিয়ার কেউ জান্‌বে না, বিশেষতঃ আমরাও তাহাকে স্বহস্তে নিধন কর্‌ব না।"

সম্রাট সজল নয়নে উত্তর করিলেন "দুনিয়ার কেউ না জান্‌লেও দুনিয়ার সকলের উপর যিনি মালিক তাহার চক্ষে ত এ অবৈধ পাপানুষ্ঠান অলক্ষিত থাক্‌বে না।"

দায়ুদ আবার কি চুপি চুপি বলিল, সম্রাট এবার যেন শয়তানের কুহক মায়ায় আবদ্ধ হইলেন তাঁহার মুখ একটু প্রফুল্ল হইল ; বলিলেন "তোমরা যা ভাল বুঝ কর।"

ভৃত্য পাঞ্জায় বাদসাহের স্বাক্ষর লইয়া দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

করহাদ দুর্গম পাহাড়ের মধ্যে বসিয়া গাহিতেছিল। সূচীভেদ্য গহন কানন, যোজনব্যাপী পর্ব্বত। সেই পাহাড়ের মধ্য দিয়া সারা বৎসরের পরিশ্রমের পর সে দীর্ঘ পথ প্রস্তুত করিয়াছে। আজ তার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে, কেবল সাধনার পাশে সিদ্ধি আসিয়া এখনও দেখা দেয় নাই। সে তার সাধের অরণ্য ছাড়িয়া আসিবার সময় একবার পাথরের শিরীর দিকে চাহিয়া গাহিতেছিল—

'আমি-যদি সাধিয়া
(পড়ি) চরণে লুটিয়া
আপনা ভূলিয়া।
অভাগা বলিয়া
বারেক চাহিয়া
(তুমি) লইবে না তুলিয়া॥
যদি মরি কাঁদিয়া
তোমারি লাগিয়া
দরশ মাগিয়া।

তুমি কি দেখিয়া
আসিবে না ছুটিয়া
শুধু ভালবাসিয়া॥'

গান শেষ হইল ফরহাদের দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। সে পাথরের শিরীর পদতলে বসিয়া মুখের দিকে চাহিয়া, বড় করুণস্বরে বলিতেছিল "তুমি কথা কইবে না? আমি এত ক'রে ডাক্‌ছি একবার শুন্‌বে না? তোমার পায়ে পড়ি, আমার উপর রাগ কর না। আমি বড় দরিদ্র, আমার কিছু নাই। আমি নিরাশ্রয়, কেবল তোমার মুখ দেখেই আমি বেঁচে আছি, তুমি মুখ ভার ক'রে থেক না, তা হ'লে আমি কি নিয়ে সুখী হ'ব? তুমি হাস, আমি হাস্‌তে হাস্‌তে লুটে পড়ি। তুমি কথা কও, আমি পৃথিবীর বীণাগুলোকে টিট্‌কারী দিই। কই তবু কথা কইলে না? আমায় কাঁদাবে? আর যে কাঁদ্‌তে পারি না। কত বছর ধরে কাঁদ্‌ছি, তবু তোমার দয়া হল না, কত শীত বর্ষা বসন্ত তোমার পায়ের তলায় বসে কাটিয়েছি তবু করুণা হল না? তবে আমি মরি?—তোমার নিঃশ্বাস বুকে নিয়ে মরি? তুমি তো করুণা ক'র্লে না? তবে যাই—আর ডাক্‌লেও আস্‌ব না! একবার ঘুমালে আর জাগাতে পার্‌বে না!"

"ফরহাদ মিঞা! ফরহাদ মিঞা! সর্ব্বনাশ হয়েছে!" চারিজন কৃষ্ণ পরিচ্ছদধারী রাজকর্ম্মচারী চক্ষে রুমাল দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ফরহাদের সম্মুখে আসিয়া এই কথাটী বলিল।

তন্ময় ফরহাদ প্রথমে সে কথা শুনিতে পায় নাই। তাহারা পুনর্ব্বার বলিল "কেন মিঞা, আর বসে বসে অনর্থক এ গহন বনে কালহরণ কচ্ছ, দেশে ফিরে যাও। যার জন্যে এত পরিশ্রম কল্লে,—সবই অদৃষ্ট মিঞা—কি করবে?"

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক এবার শুনিতে পাইল। মণিহারা ফণীর ন্যায় জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে দোস্ত!"

"আর কি হয়েছে, সব শেষ হয়েছে! শিরী বিবি আর এ সংসারে নাই!"

"কি বল্লে—কি বল্লে, আমার শিরী এ সংসারে নাই? আমার শিরী এ দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে? আমি এখনও পৃথিবীতে রয়েছি?"

"এতক্ষণ বোধ হয় কবর দেওয়া হ'য়ে গেল।"

"কবর দেওয়া হ'য়ে গেল! উঃ! স্বর্গরাজ্যের দ্বারে যেতে না যেতে আমি তাঁকে ধরব, সেখানে আমার গমনে কেউ বাধা দিতে পারবে না। সম্রাটের সশস্ত্র প্রহরীরা সেথায় প্রবেশ করতে পারবে না। যাই দেরী হ'লে ধরতে পারব না।"

এই বলিয়া হস্তস্থিত পাথর কাটার কুঠার দ্বারা শিরীর নাম লইয়া সে সজোরে নিজ মস্তকে আঘাত করিল! এবং ধরিত্রী বক্ষে পড়িয়া মূর্ছিত হইল।

কিয়ৎক্ষণ পর তাহার চৈতন্য হইল; কিন্তু উঠিয়া বসিল না, সে নিরাশ প্রেমের গান আর গাহিল না, কেবল মুক্ত প্রকৃতির দিকে চাহিয়া, দৃষ্টি অনেকক্ষণ স্থির করিয়া রাখিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া জলের ধারা বহিতেছিল। বড় মৃদুস্বরে জনমের মত বলিল আমার শিরী! আমার শিরী! ঐ না তুমি? একটু দাঁড়াও, আমি যাই। ও রাজ্যে নীচ উচ্চের বিচার নাই, ভাল-বাসায় বিরহ নাই, পূর্ণিমায় অমাবস্যা নাই। এ জীবনে তোমার আমার মিলনের আশা ছিল না ঐ জীবনের পরপারে—ঐ তারার মণ্ডলীর মধ্যে তুমি দাঁড়াও! আমি গিয়ে অনন্ত জীবন ধরে তোমার আরাধনা করব। শিরী আমার! শিরি! শি—রি!”

পিঞ্জর ছাড়িয়া কাননের পাখী কাননে উড়িয়া গেল! যেন বড় অভিমানে অসহিষ্ণু পুষ্প কোরকটী প্রভাতেই ঝরিয়া পড়িল! বনের সঙ্গীরা কত ডাকিল, কে সাড়া দিবে? যে হাসিত কাঁদিত সে চলিয়া গিয়াছে, বন শ্মশান করিয়া চলিয়া গিয়াছে। পাখীরা সে দিন আর আহার

অন্বেষণে গেল না, ফুল সে দিন আর মুখ খুলিল না, বন জুড়িয়া ক্রন্দন উঠিল। স্বভাব কাঁদিয়া আকুল হইল। প্রকৃতির শিশু প্রকৃতির বক্ষে ঘুমাইয়া পড়িল !!

আমাদের নিষ্কাম প্রেমের চরিত্র সমালোচনার শেষ হইয়াছে। দুঃখের সমুদ্রকূলে দাঁড়াইয়া আমরা প্রথম ফরহাদের চরিত্র আঁকিয়াছিলাম আর আজও দুঃখের গভীর তরঙ্গে তার জীবন তরণী কাল সমুদ্র গর্ভে ডুবাইয়া দিলাম। প্রেমের পূজা করিতে করিতেই তার জীবনের শেষ হইল। প্রস্তরের দিকে চাহিয়া চাহিয়াই চক্ষু দৃষ্টিহীন হইল। তৃষিত হৃদয় শুধু শূন্য স্বভাবের বুকে একটা আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া রাখিল।

পারস্যের শৈলে শৈলে, বনে বনে, তরুতে তরুতে, এ করুণ আখ্যায়িকার নীরব ক্রন্দন ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ফরহাদের মূর্চ্ছিত বক্ষের উপর বসিয়া কত অজানা রাজ্যের পাখী আসিয়া রোদন করিয়া গিয়াছে, কত ব্যাঘ্র ভল্লুক হিংস্র জন্তু সে দেহ স্পর্শ করিতে আসিয়া প্রেম পুলকিত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। শারী, শুকের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়াছে লতা, তরুর কোলে মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে !

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রেম! কখন তোমার স্বরূপ প্রকাশিত হয়? যখন রূপের অনুভূতি হৃদয়ে হৃদয়ে জাগিয়া মানবকে প্রিয়তমের চিন্তায় বিভোর করে তখন কি? যখন হাস্যময়ী উষার হেমকিরীটতলে মহিমার কণা ছড়াইয়া পড়ে, মুগ্ধ হৃদয় ভিক্ষার্থীর মত তাহাই কুড়াইয়া লইবার জন্য ছুটিয়া যায় তখন কি? যখন আধ বিকশিত আধ বদ্ধ পুষ্প কোরকটীর সৌরভ মদিরায় প্রাণ মাতোয়ারা হইয়া উঠে তখন কি? যখন দুব দূরান্তরের উন্মত্ত বংশীধ্বনি সান্ধ্য পবনে নৃত্য করিতে করিতে কর্ণকুহরে আছড়াইয়া পড়ে তখন কি? যখন দুটী আকাঙ্ক্ষিত জীবন এক চুম্বনে এক মুহূর্ত্তে এক হইয়া যায় তখন কি? না। তবে তুমি কোথায় প্রেম? রূপের লালসায় নাই, দেখিবার আকাঙ্ক্ষায় নাই, কামনার পূর্ণাহুতি দিলেও নাই তবে তুমি কোথায় আছ প্রেম? তবে কি তুমি সেখানে—যেখানে রূপের নদীর পারে বসিয়া মানুষ শুধু দেখিয়াই যায়, পিপাসায় অধীর হইয়া এক অঞ্জলি পান করে না, সৌন্দর্য্যের অনলে

পুড়িয়া শীতল সরিতের বক্ষে ঝাপাইয়া পড়ে না, যে নিজের অস্তিত্ব গোপন করিয়া বাঞ্ছিতের দ্বারস্থ হয়, আপনাকে ভুলিয়া গিয়া আকাঙ্ক্ষিতকে জাগাইয়া তুলে, ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ করিয়া, জগত তুচ্ছ করিয়া, শিক্ষা অভিমান দলিত করিয়া প্রিয়তমের সাধনা করে, তুমি কি তাহারই নিকট আত্ম-প্রকাশ কর? তাই বুঝি তোমার একনিষ্ঠ সাধক ফরহাদকে দেখিয়া তোমার স্বরূপ নির্ণয় করিবার ইঙ্গিত করিতেছ। কামনা তাহার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে; আপনার নাম, আপনার মূল্য সে কোন্‌দিন ভাসাইয়া দিয়াছে, আপনার জীবন সমুদ্র মন্থন করিয়া প্রেমাধার তুলিতে পারিয়াছে। সে সুধা আপনি পান করিয়া মরিয়াও অমরত্ব লাভ করিয়াছে, অতি বড় দাতার ন্যায় জগতের দ্বারে দ্বারে বিলাইয়া দিয়া গিয়াছে!

শত রাজ্যেশ্বরের রাজসিংহাসনকে হীন করিয়া, ত্যাগের মুকুট শিরে ধরিয়া, পৃথিবীর নিষ্ঠুর অত্যাচারে যে নিভৃত অরণ্যের, শান্তিময় ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তার সেই নিষ্কাম রাজ্য জুড়িয়া আজ বিজয় দুন্দুভি বাজিতেছে।

এ জয় যে আত্মবলির জয়—এ জয় যে নিরাকাঙ্ক্ষার জয়; এ জয়ের কাছে বিশ্বজয় অতি তুচ্ছ। তাই আজ

পারস্যের মসনদ হইতে ঐশ্বর্য্যবান সম্রাট ও সাহজাদী শিরী এই জয় গৌরবের তলায় দীন বেশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সব হীন হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের বিপুল বৈভব, অপরাজেয় শৌর্য্য, মান, মর্য্যাদা, যশঃ এই আত্ম-ত্যাগের কাছে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না। পার্থিব বস্তুর তুচ্ছ অহঙ্কার সত্য শাশ্বত বিশ্বপ্রেমের কাছে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া তলাইয়া গিয়াছে। জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া সত্য প্রেমের পবিত্র কিরণ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 'জয় প্রেম সাধনার জয়' এই মহাবাণী প্রতি আলোক কণায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

উঠ সাধক! উঠ প্রেমিক! যে মহাপ্রাণতা আজ দেখাইয়া গেলে, যে গভীর জটিল শিক্ষা আজ দিয়া গেলে, অন্ধ জগতকে তাহা বুঝাইয়া দিতে একবার জাগিয়া উঠ। মানসনেত্রে যে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলে, তাহারই তপস্যা করিয়াছ; আজ তপস্যার শেষ!—দেখে যাও মহানির্ব্বাণ আজ কেমন করিয়া বিশ্বের দ্বারে তোমার জয় ঘোষণা করিতেছে! পূজা করিয়া আজ তুমি পূজ্য হইয়াছ, ধন্য তুমি! ধন্য তোমার সাধনা!

পারস্যের রংমহল ছাড়িয়া লোকললামভূতা শিরী আজ এই কুশকণ্টকাকীর্ণ বনভূমিতে সত্যপ্রেমের মাধুর্য্য

দেখিতে আসিয়াছেন। আজ যে এ স্থান তীর্থ—পুণ্যময় প্রেম নিকেতন! চারিদিকেই সাম্য, চারিদিকেই শান্তি। যিনি ঐশ্বর্য্যের কোলে লালিত হইয়া আসিয়াছেন, দুঃখ ব্যথার কণামাত্রও যাঁহাকে সহিতে হয় নাই, আকাঙ্ক্ষা যাঁহার ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে সেই কোহস্থান রাণী—পারস্যের ভাবি সাম্রাজ্ঞী আজ এ দৃশ্য দেখিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছেন, বুঝিয়াছেন এত বড় ত্যাগ, এত বড় হৃদয়দান জগতের কোন ইতিহাসে লেখা নাই। তিনি আত্মজীবন আলোচনা করিলেন, দেখিলেন প্রেমের গর্ব্ব যত টুকু তাঁহার ছিল, তাহা এই মহান আদর্শের কাছে এত নগণ্য যে ইহার পদনখরেও স্থান পাইতে পারে না। আপনার জীবনকে তিনি শত ধিক্ দিলেন, জীবন ভার বলিয়া বোধ হইল। মহত্বের আলোকে, সত্য প্রেমের মধুরিমায় যখন তাঁহার ভেদজ্ঞান কাটিয়া গেল তখন তিনি শিরের রত্নমুকুট ঘৃণাভরে দূরে নিক্ষেপ করিলেন, অঙ্গের রত্ন অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিলেন। সেখানকার পবিত্র মৃত্তিকা চুম্বন করিয়া পুলকভরে বলিলেন "এতদিনে নবজীবন লাভ করলুম" পরে যোড়-হস্তে নতজানু হইয়া তিনি বসিয়া আবার বলিতে লাগিলেন "কে তুমি মহৎ! প্রেমধর্ম্মের প্রবর্ত্তক! আমার অন্ধ

তর্কের মধ্যে সত্যের সন্ধান ক'রে দিলে। এত দিন প্রেম চিনি নাই—প্রেমের সাধনা কি বুঝি নাই। প্রেমমন্ত্রে যে কি সুধা নিহিত আছে ক্ষুদ্র নারী তা বুঝতে পারি নাই। তুমিই আমায় চিনায়ে দিলে, অমৃতের সন্ধান বলে দিলে, তাই আজ আমার হৃদয় জুড়ে গভীর আন্দোলন চলেছে, দেখ প্রভূ! তোমার নির্দ্দেশ যেন বিস্মৃত না হই। শিরির করুণ স্বরে বাদসাহের চক্ষু পল্লব আর্দ্র হইয়া আসিল, এ দৃশ্য তাঁহার নিকট স্বপ্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইল। সাহজাদী আজ হীরক, মতি, পান্না, ঐশ্বর্য্য অহঙ্কার এমন করিয়া পদদলিত করিয়া দাঁড়াইলেন যে সম্রাট মুগ্ধনেত্রে নির্ব্বাক ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

যখন শায়িত আদর্শ প্রেমিকের পার্শ্বে বসিয়া নতজানু সাহজাদী শিরী সত্য প্রেমের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে-ছিলেন, তখন বিশ্ব জগত কাঁদিয়া আকুল হইতেছিল। বাদসাহ খসরু সাহজাদীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "খোদার আশীর্ব্বাদে ফরহদে অমর! কোহস্থান রাণি! ফরহাদের এ নশ্বর দেহের সমাধির আয়োজন করিয়া চল তোমার উপযুক্ত বাসস্থান রাজ অন্তঃপুরে চল।"

একবার করুণ দৃষ্টিতে খসরু সাহের দিকে চাহিয়া

শিরী উত্তর করিলেন ' না সম্রাট। আর আমায় প্রলোভন দেখাবেন না, আজ যে রাজ্যের সন্ধান পেয়েছি, তার চেয়ে বড় রাজ্য খোদা সৃষ্টি করেন নাই। ঐ দেখুন আমার প্রেম মন্ত্রের উপদেষ্টা, আমার জীবন গতির পথ প্রদর্শক আমার গুরু, ঐ মৃত্তিকার উপর শুয়ে আছেন, জগতকে শিক্ষা দিয়েছেন 'ভোগে আমি নাই, রাজসিংহাসনে আমি নাই, আমি আছি ত্যাগে- এই মৃত্তিকায়।'

এর [illegible]। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন "সঙ্কীর্ণ এ জগৎ, [illegible] কতটুকু ভালবাসতে জানে জগতের প্রাণী! আজ [illegible] যে ভালবাসে কাল তাকে ভুলিয়া যায়। কামনা [illegible] ভালবাসে, কামনা মিটিলে দূর করিয়া দেয়। আজ যা [illegible] করে কাল তার বিসর্জ্জন দেয়। তবে এ প্রেম [illegible] প্রেম কি মুহূর্ত্তের ? না সম্রাট! প্রেম অনন্ত — [illegible] কালের। দুঃখ করবেন না জনাব! আজ আমি অ[illegible] [illegible] জিনিসের সন্ধান পেয়েছি, পারস্যের অন্তঃপুর [illegible] সলিম করি—কিন্তু এই বনে, এই সাধকের সমাধির [illegible] আমার সম্পূর্ণ জীবন অতিবাহিত হবে।"

বলা[illegible] [illegible] চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল তিনি উন্মত্তবৎ [illegible] ফেলিলেন "শিরীহীন রাজ্যে আমার কোন [illegible] নাই" সম্রাটের প্রাণে তখন ফরহাদের

প্রতি দুর্ব্যবহারের কথা জাগিয়া উঠিয়া তাঁহার হৃদয়ের সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলি পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিতেছিল! অস্থি পঞ্জর যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ কে যেন তাঁহার কানে কানে বলিয়া গেল "খসরু, সাবধান! প্রায়শ্চিত্ত কর!" তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, উচ্ছ্বাস স্বরে বলিয়া উঠিলেন "মহিমময়ি! তোমার সাধনা কুটীরে হতভাগ্য পারস্য সম্রাটের একটু স্থান ক'রে দিও!"

সাহজাদী চক্ষে রুমাল দিয়া মস্তক অবনত করিলেন।

উপসংহার।

সব শেষ হইয়াছে। এইবার উপসংহার। গভীর দুঃখের পর উজ্জ্বল মিলন দৃশ্য লইয়া হাসির নাটকের ক্রোড়াঙ্কে আমরা উপনীত হই নাই। বিষাদের বৃষ্টি-ধারায় উদ্ভূত জল বুদ্‌বুদ্‌ বিষাদেই লয় পাইয়াছে। সুতরাং আমাদের বলিবার কিছুই নাই। তথাপি একটা কথা না বলিলে হয় না। সেই গভীর বনের নির্জ্জন নিকেতনে একটী সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পারস্য, আরব, তুরস্ক হইতে শত শত তীর্থযাত্রী ইস্পাহানের সেই পর্ব্বত-ময় কাননটী দর্শন না করিয়া ফিরিয়া যায় নাই। কেহ কেহ ভক্তিভরে সেই স্থানের মৃত্তিকা চুম্বন করিয়া যাইত। সমাধির শিরোদেশে কৃষ্ণ প্রস্তরের উপর স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল

"স্বর্গীয়-প্রেম।"

* * * * *

সেই মন্দিরে প্রতিদিন গভীর নিশিথে কে এক কুমারী আসিয়া সমাধির উপর রাশি রাশি ফুল নিক্ষেপ

করিয়া যায়। সমাধি প্রাঙ্গন নিজের দীর্ঘ কেশ দ্বারা মার্জ্জন করিয়া দেয়। আবার কখন কখন সমাধিতলে বসিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে করযোড়ে বলিতে থাকে "হে মহাপুরুষ! তুমিই আমার হৃদয়ে পুণ্যের আলো জ্বেলে দিয়েছ, হতভাগিনী রেজিনা তোমার দয়াতেই আজ বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা হ'য়েছে। তার এই ছিন্ন ফুলগুলি গ্রহণ কর।"

সম্পূর্ণ।